বাসর লগ্ন

প্রণব রায়

ঝড়ের গোঙানির মধ্যেও ঘর্ঘর্ আওয়াজটা কানে আসছে। শুধু কানে আঁসছে না, কাছেও আসছে ক্রমশ। পাথুরে পাহাড়ী রাস্তায় লোহা-বাঁধানো চাকার আওয়াজ। বিশ্রী আর অস্বস্তিকর চ্যাঁচানির মত। কিন্তু আওয়াজটা একেবারে বাংলোর সামনে এসে থামল যে!

কান খাড়া হয়ে উঠল অমরনাথের। সবে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে যাচ্ছে সে। আজ সাড়ে তিন মাস কি যে হয়েছে তার, ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুমোতে পারে না। ছটফট করে সারারাত। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়ায় অন্ধকারে ভূতের মত। মনে হয় এই রংডুরি পাহাড়ের টঙে এই কাঠের বাংলোর খাঁচায় কেউ যেন তাকে বুনো পশুর মত কয়েদ করে রেখেছে।

সবই সুমিতার জন্যে। পাহাড়ের চূড়োয় এই নির্বাসন, বিনিদ্র রজনীর এই যন্ত্রণা—এ সবই সুমিতার জন্যে। বাধ্য হয়ে তাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হয় রোজই রাতে। ঘুম ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি করে? আর সেই ওষুধ আটাশ মাইল দূরের সান্ টুঙ্ স্টেশনের ডাক্তারখানা থেকে হপ্তায় হপ্তায় নিয়ে আসে তার চাকর খুবলাল। হল্‌দে রঙের ছোট ছোট ট্যাবলেট। প্রথম প্রথম একটাতেই কাজ হত, তারপর দাঁড়াল ছুটোতে। এখন কোনদিন তিনটে, কোনদিন চারটে অবধি। নেশাই একরকম বলতে গেলে!

তবু সুমিতাকে ভুলতে পারল কই! এখনও মাঝে মাঝে

অতর্কিতে সুমিতা এসে তার সুযুপ্ত রাত্রির শান্তিকে অতীত স্মৃতির ছুরি দিয়ে যেন ফালা ফালা করে চিরে দিয়ে যায়। সুমিতা সত্যিই আসে না, আসে তার স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন বলাই ভাল। আর সেই দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝ রাতে জেগে-ওঠা অমরনাথ অন্ধকারে পায়চারি করে বেড়ায় এ ঘর থেকে ও ঘর। কখনও বা পাগলের মত চিৎকার করে ডাকে সুমিতাকে। কখনও বা আরও বেশী পাগলামী দেখা দেয়। দড়াম করে দরজা খুলে রাইফেল হাতে বাংলোর বারান্দায় বেড়িয়ে এসে নিচের অন্ধকার পাহাড়ী অরণ্য লক্ষ্য করে এলোপাথারি ফায়ার করে। সে-শব্দে শাল-শিরীষের জঙ্গলে ছুটে পালায় নীল-গাই আর হরিণ, চমকে জেগে ওঠে বুনো ভাল্লুক আর ক্রুদ্ধ জবাব দেয় অরণ্যের ডোরাকাটা হিংসা। তারপর খুবলাল ছুটে এসে এক-সময় হাত চেপে ধরে অমরনাথের। ভয়ানক ক্লান্তি বোধ হয় তার। রাইফেলটা খুবলালের হাতে দিয়ে অবসন্ন পায়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।

কিন্তু দিনে অমরনাথ অন্য মানুষ। পায়ে গামবুট আর মাথায় সোলা-হ্যাট পরে' নাগা কুলীদের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে সারাদিনটা দিব্যি কাটিয়ে দেয়।ভারত সরকারের বন-বিভাগের চাকরি। মুস্কিল হয় তার রাত হলে। সব কাজ ফুরিয়ে যায়! নিজেকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না অমরনাথ। রাতের অন্ধকার কালো পাখা ছড়িয়ে বিরাট একটা বাদুরের মত নেমে আসে রংভুরি পাহাড়ের মাথায়। অমরনাথের ভয় করতে থাকে। আবার সেই বিনিদ্র দুঃ সহ যন্ত্রণা। আর সঙ্গে সঙ্গে হলদে রঙের সেই ছোট ছোট ট্যাবলেট-গুলির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে থাকে অমরনাথ। আজও চারটে খেয়েছে। তা হোক, এখনও ট্যাবলেটের কাজ শুরু হয়নি। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার এখনও সজাগ। নইলে ঝড়ের গোঙানির মধ্যেও

পাহাড়ী পাথুরে রাস্তায় লোহা বাঁধানো গাড়ির চাকার আওয়াজ সে শুনতে পাবে কেন? কিন্তু আশ্চর্য লাগছে, আওয়াজটা তারই বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল বলে। কে আসতে পারে দুর্যোগের এই ঝোড়ো রাতে? নেপালী কন্‌ট্রাক্টর জংবাহাদুর নিশ্চয়ই। পাহাড়ী চোলাই মদ আর নাগা কুলী-মেয়েদের লোভে মাঝে মাঝে সে বেমক্কাভাবে এসে হাজির হয় এই রংডুরি পাহাড়ে, আর নেশায় চুর হয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে যায় অমরনাথেরই বাংলোয়। বারান্দার একধারে একটা পার্মানেণ্ট চারপাই পাতা আছে তার জন্যে।

ঠিক তাই। বুনো হাতির মত সদর-দরজার কপাট দুটো দুম্‌-দাম্‌ করে যেভাবে পিটছে, এ জংবাহাদুর না হয়েই যায় না। ভারি বিরক্তি বোধ করলে অমরনাথ। বাইরে নেহাৎ ঝড় বইছে, নইলে খুবলালকে সে আজ মানাই করে দিত দোর খুলতে। লোকটাকে আচ্ছা করে ধমকে দিতে হবে, যাতে আর কখনও রাত-বিরেতে—

অমরনাথের মনে বিদ্যুতের মত একটা ভাবনা খেলে গেল। যদি কোন গরীব নাগা কুলী তার রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাইতে এসে থাকে? ছি ছি, ঝড়ের মধ্যে তাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা কোনমতেই উচিত হয়নি অমরনাথের।

চটিটা পায়ে গলিয়ে উঠে পড়ল অমরনাথ। টেবিলের ওপর থেকে নিল টর্চ, তারপর বারান্দা পেরিয়ে সদরের কপাট দুটো দিলে খুলে। সাত-ব্যাটারি টর্চের একঝলক আলো ঝক্‌ঝকে রূপোলি ছোরার মত অন্ধকারে আমূল বিঁধে গেল। আর সেই আলোতে যা দেখা গেল, তাতে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না।

না, নেপালী কন্‌ট্রাক্টর জংবাহাদুর নয়, রুগ্ন সন্তানের জন্যে দাওয়াই-এর আর্জি নিয়ে কোন নাগা কুলীও নয়, পাহাড়ী পথের ধুলো আর ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতায় বিপর্য্যস্ত একটি মেয়ে। মাথার

ঘোমটাটা মুখের ওপর বাঁকা ভাবে টেনে ধুলো থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ায় টানা একটা পাল্কী গাড়ি। এই রংডুরি পাহাড়ের ছোট হিল স্টেশনের ধারে সওয়ারীর আশায় যাদের থাকতে দেখা যায়। অমরনাথ কি করবে আর কি বলবে, ভাববার আগেই মেয়েটি বলে উঠল—কি, ভেতরে যেতে দেবে না নাকি ? সরো—

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি তার পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল-ভেতরে। আর সেই আশ্চর্য মধুর গলার আওয়াজে ছলাৎ করে দুলে উঠল অমরনাথের বুকের রক্ত···

সুমিতা !

সদর-দরজা খোলা রেখেই ঘরে ফিরে এল অমরনাথ।

হ্যাঁ সুমিতাই বটে ! কিন্তু এ কি বেশভূষা সুমিতার ? এ কি সুমিতা, না সালঙ্কারা কোন জীবন্ত প্রতিমা ? বড় বড় রুপোর ফুলতোলা জরদ রঙের বেনারসী পরনে। সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝিকিমিকি। মাথায় সীঁথিমৌর, কপালে কনে-চন্দন, আর গলায় যুইয়ের গোড়ে। এ কোন্ সুমিতা ?

অমরনাথের খাটে ধপ্ করে বসে পড়ল সুমিতা। ফেলে দিল মাথার ঘোমটা। বেরিয়ে পড়ল সাত গুছির বিনুনি দিয়ে বাঁধা মস্ত চ্যাটালো খোঁপা। প্রতিমার যেমন চালচিত্র। সুমিতার এমন সেকেলে খোঁপা অমরনাথ আগে কখনও দেখেনি। দেখেনি আরও একটা জিনিস। খোঁপায় গোঁজা ছোট একটা রুপোর কাজললতা।

সুমিতার মুখের হাসিটা এবার কালো চোখের তারায় ছড়িয়ে গেল। বললে, বোবা হয়ে গেলে যে ! চিনতে পারছ না নাকি ?

অমরনাথের যেন চেতনা হল। ধীরে ধীরে শুধু প্রশ্ন করলে, হঠাৎ এলে যে ?

পালিয়ে এসেছি !

কোথেকে ?

কাকার বাড়ি থেকে। মানে সেই সাতের এক নিবেদিতা লেন থেকে।

সেকি ! এসময় তো ট্রেন আসে না ?

আজ এসেছে। রংডুরি স্টেশনে পৌঁছতে ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট।

ও ! এ সাজ কেন তোমার ?

এ কিসের সাজ জানো না ?

জানি, বিয়ের।

জানো তো জিজ্ঞেস করলে কেন ? বুঝতেই তো পারছো আজ আমার বিয়ে।

বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে অমরনাথ বললে, বিয়ে ! আর তুমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এলে ! কেন ? কি জন্যে ?

স্থির চোখে তাকিয়ে শান্ত গলায় সুমিতা জবাব দিলে, বিয়ে করব বলেই তো পালিয়ে এলাম এখানে।

তালগোল পাকিয়ে গেল অমনাথের মাথার মধ্যে ঃ এসব কি বলছে সুমিতা ? এখানে বিয়ে ? কার সঙ্গে ?

দশ সেকেণ্ড চুপ করে থেকে খিলখিল করে হেসে উঠল সুমিতা। আজ তার সেই ধাতব হাসির আওয়াজে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল দশ সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, সুমিতা সেনের বিয়ে কার সঙ্গে হতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

আমি তার কি জানি !

জানো বৈকি! পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউই জানে না।

আরও কুণ্ঠিত হয়ে গেল অমরনাথ। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, ঈশ্বর বা শয়তান—যে কোনো একজনের দোহাই, হেঁয়ালি ছাড়ো সুমিতা! সোজা করে বল, কার সঙ্গে তোমার বিয়ে? কে সে?

সুমিতার হাসি মাখানো ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল: অমরনাথ চৌধুরী।

সপাং করে কে যেন চাবুকের বাড়ি মারল অমরনাথের বুকের ঠিক মাঝখানটায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো পুরোনো ক্ষতমুখ দিয়ে। টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে আঘাত সামলে নিল সে। তারপর গলাটা অস্বাভাবিক রকম খাদে নামিয়ে এনে বললে: তুমি কি সত্যিই সুমিতা, না আর কেউ?

কপালে কনে-চন্দন আর গলায় যুঁইয়ের গোড়ে নিয়ে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে সুমিতা আর মিটিমিটি হাসছে। হেসে বললে: ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছ, না? হবারই কথা। নিবেদিতা লেনের সেই দেমাকি মেয়ে সুমিতা সেন এতদিন বাদে খুঁজে খুঁজে বাগবাজার থেকে রংভুরি পাহাড়ে তোমায় বিয়ে করতে ছুটে আসবে, ভাবাই যায় না। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার। বাগবাজারের বিয়ে-বাড়ি থেকে পালিয়ে না এলে আমাকে দ্বিচারিণী হতে হতো।

চিত্র-করা দুই চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে অমরনাথ। অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত স্তব্ধ। কেবল চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। অথচ চাপা দ্যুতিতে ভরা। একদৃষ্টে সে দেখছে সুমিতাকে।

খাট থেকে নেমে এল সুমিতা। খসে পড়ল বেনারসী আঁচল। বেজে উঠল অলঙ্কারের রিনিঝিনি। উসখুস করে উঠল ঘরের বাতাসে যুঁইয়ের গন্ধ। অমরনাথের একান্ত সন্নিকটে এসে বলল: চুপ করে

আছ কেন? আমি সুমিতা, তোমার সুমিতা। বিশ্বাস না হয়, ছুঁয়ে দেখো আমাকে। দেখো না!

অমরনাথের চোখে পলক নেই। বাইরে ঝড়ের গোঙানি। কোন অদৃশ্য রাক্ষস যেন রাত্রির ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে। পুরোনো কাঠের বাংলোর কোন ফাটলে একটা তক্ষক ডেকে উঠল। জঙ্গলের মধ্যে পাখা ঝটপটিয়ে ককিয়ে উঠল একটা বন-ময়ূর। ময়াল সাপে ধরেছে বোধ হয়।

অমরনাথের বুকে একটা হাত রেখে সুমিতা আবার ডাকলেঃ শুনছ, আমি সুমিতা। কি হয়েছে তোমার, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ?

কেমন যেন আচ্ছন্নের মত অমরনাথ বলে উঠল, দেখছি আর এক সুমিতাকে। সন্ধ্যেবেলা কার্জন পার্কে বসে একদিন যে বলেছিল, 'ভালবাসি' আর, নিবেদিতা লেনের সেই বৈঠকখানায় আর একদিন যে বলেছিল, 'ঠাট্টাও বোঝ না? তোমার মত পুরুষকে নিয়ে আমার মত মেয়েরা দু দিন খেলা ছাড়া আর কি করতে পারে?' তার সেই ধাতব হাসির আওয়াজটা আজও স্পষ্ট মনে আছে!

ধীরে ধীরে সুমিতা সরে গেল জানলার কাছে। যেখানে ঝড়ের গোঙানি আছড়ে পড়ছে বন্ধ শার্সির ওপর। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ। কাঁপছে দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের পাতা। অমরনাথের দিকে পিছন ফিরে বলতে লাগল, সেদিন যদি ওকথা না বলতুম, কাকার হাণ্টারে ক্ষত-বিক্ষিত হয়ে যেত তোমার পিঠ। কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে সুমিতা কি ভাবে নিজের মনকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল সেদিন, তুমি তা জানতে না। জানলে কি সুমিতার প্রতি অতখানি ঘৃণা নিয়ে সেদিন চলে আসতে পারতে? আজও, আগের মুহূর্ত অবধি, না বললে তুমি বুঝতে পারতে না, কোন সুমিতা সত্যি!

কেমন একটা তিক্ত স্বাদ লাগছে অমরনাথের মুখে। তারই দরুন কুঁচকে গিয়েছিল ঠোঁটের দুই প্রান্ত। তাকে হাসি বলা চলে না। সেই বিকৃত হাসি নিয়ে অমরনাথ বলল, তোমার কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে এখনও বুঝতে পারছি না, সুমিতা।

মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে সুমিতা। তবু মনে হল যেন অনেক দূর থেকে বলছে ঃ আমার সবই মিথ্যে, সত্যি শুধু ভালবাসা।

সেই বিকৃত হাসিতে আরও বিকৃত হয়ে গেল অমরনাথের ঠোঁট।

ভালবাসা! দাঁড়াও, দাঁড়াও, কলম আনি, কাগজ আনি, স্ট্যাম্প আনি, 'ভালবাসি' লিখে আগে সই করে দাও।

ঝড়ের ধাক্কায় হঠাৎ খুলে গেল বন্ধ শার্সি, উল্‌টে পড়ে গেল একটা চীনে ফুলদানী, ডেকে উঠল কাঠেব ফাটলে তক্ষক। আর দুই চোখে অদ্ভুত মায়াবী দৃষ্টি নিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল সুমিতা অমরনাথের ঠিক মুখোমুখি। বললে ঃ ঠাট্টা করতে চাও করো, কিন্তু আজ নয়। আজ আমাদের বিয়ে।

বিয়ে। পাগলের মত কি বকতে শুরু করেছ সুমিতা?

এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? তাকিয়ে দেখো তো আমার মুখের পানে! এ মুখ কি সেই সুমিতার নয়? কার্জন 'পার্কে বসে যে তোমাকে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল? আর বলেছিল সারা জীবন অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে—তোমাকে স্বামী-রূপে পাবার জন্যে! দেখো, ভাল করে চেয়ে দেখো—এ মুখে কি শুধুই অবিশ্বাস, শুধুই ছলনা, শুধুই মিথ্যে? এতটুকুও সত্যি কি নেই? দেখো, আরও ভাল করে দেখো!

দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের কোল দিয়ে তরল মুক্তা গড়িয়ে পড়ছে পুরোনো হাতির দাঁতের মত ফিকে হলদে গালের ওপর। থর্‌থর্ করে কাঁপছে শুকনো গোলাপ-পাপড়ির মত ম্লান ঠোঁট দুখানি। একপাশে হেলে

পড়েছে সীঁথিমৌর। দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের কাছে যুঁইয়ের গোড়ে ওঠানামা করছে।

সুমিতার চোখে চোখ রেখে অমরনাথের ঘোলাটে দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়ে আসছে। হ্যাঁ, এই তো সেই সুমিতা! পড়ন্ত ফাগুন-বেলায় যে-মেয়েটি একদিন শপথ করেছিল, সারাটা জীবন সে অপেক্ষা করবে অমরনাথকে স্বামী রূপে পাবার জন্যে। হ্যাঁ, এবার তাকে চিনতে পারছে অমরনাথ। এই তো সেই সুমিতা, যে কলকাতা থেকে দুর্যোগ মাথায় করে অনায়াসে 'পালিয়ে আসতে পারে এই দুর্গম রংডুবি পাহাড়ে, শুধু অমরনাথের জন্যে।

আর কোন সংশয় নেই অমরনাথের। হারানো সুমিতা ফিরে এসেছে। কিন্তু এই কি আসার সময়? আকাশে যখন প্রলয়ের মশাল জ্বলছে ক্ষণে ক্ষণে, বাতাসে যখন ঝড়ের গোঙানি, আর শাল-শিরীশের জঙ্গলে খ্যাপা বাঘের গর্জন—এই কি প্রিয়ার অভিসার লগ্ন? কেন এল না সুমিতা ফুল জ্যোৎস্না-রাত্রে? শাল-শিরীষের শাখায় শাখায় যখন ঝুরুঝুরু ফুলরেণু ঝরে আর সুরের লহরীতে আকাশ ছেয়ে দেয় রাতজাগা পাপিয়া!

অমরনাথের গালে সুরভিত নিঃশ্বাস লাগিয়ে সুমিতা বলল ফিস্‌ফিস্ করে, শুনছো, রাত যে আর বাকি নেই। লগ্ন পার হয়ে না যায়। এখানে পুরুত পাওয়া যাবে তো?

বুকের কাছে সুমিতাকে আরও ঘন করে ধরে অমরনাথ বললে, কি দরকার পুরুতে? বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে তিন বছর আগে।

তবু আমরা হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়ে। দেবতা আর আগুন সাক্ষী না রাখলে কি চলে? সমাজই বা কি বলবে?

কিন্তু পুরুত এখানে কোথায় পাব সুমিতা? কে বিয়ে দেবে আমাদের এই ঝড়ের রাতে?

না-ই বা পাওয়া গেল পুরুত, কোনো মন্দির-টন্দির নেই এখানে, কোনো ঠাকুরের মন্দির ?

অমরনাথ ভেবে বললে, নাগাদের কালী-মূর্তি একটা আছে নিচের জঙ্গলে। কিন্তু—

উল্লসিত হয়ে উঠল সুমিতা। বললে, সেই ভাল। দেবীর সামনে আমাব মাথায় তুমি সিঁদুর দেবে চল। সেই হবে আমাদের বিয়ে।

অমরনাথেব চোখে উদ্বেগ দেখা দিল : এক সৃষ্টিছাড়া খেয়াল তোমার সুমি ? এই অন্ধকার রাতে—ওই জঙ্গলে—

অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল সুমিতা : কোন ভয় নেই গো, দেবীর দয়ায় কোন বিপদ হবে না, এসো তুমি। রাত শেষ হয়ে আসছে, লগ্ন পার হয়ে না যায়। এসো তুমি—

তবু আপত্তি জানায় অমরনাথ, আজ থাক সুমি। রাত অনেক, বাইরে ঝড়। কাল বরং—

সুমিতার চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠল সেই অদ্ভুত মায়াবী দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে বলে উঠল : না, না, না, কাল নয়, পরশু নয়, কোনদিনই নয়। আজই রাতে—লগ্ন পার হবার আগে। এসো, চলে এসো—

লুটিয়ে-পড়া বেনারসীর আঁচল মাথায় তুলে দিলে সুমিতা। দেহের ছন্দে ছন্দে জাগল নববধূর লাবণ্য, অভিসারের মাধুরী। দু' পা এগিয়ে একবার পেছন ফিরে আয়ত চোখের ইসারায় ডাকল অমরনাথকে। আর সেই মোহিনী দৃষ্টির মায়ায় সম্মোহিতের মত তাকে অনুসরণ করল অমরনাথ। হাতে রইল শুধু সাত-ব্যাটারির টর্চ বাতিটা।

সদর-চৌকাট পার হতে গিয়ে বেধে গেল পায়ে। হুমড়ি খেয়ে

পড়ছিল সুমিতা, ধরে ফেলল অমরনাথ। বলতে গেল : একটু বসে যাও, কিন্তু তার আগেই সুমিতা গিয়ে পৌঁছেছে ফটকের কাছে।

টর্চের বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল অমরনাথ। বুঝতে পারল—এ মেয়েকে রুখতে পারে, আজ ঝড়েরও ক্ষমতা নেই!

পেছনে সদর দরজার কপাট হুটো ঝড়ের বাতাসে আছড়ে পড়তে লাগল বারবার।

এ কেমন বিবাহ-যাত্রা ?

ঝোড়ো হাওয়ার শাঁখ বাজছে ভয়াল সুরে। হাহাকার করে উলু দিচ্ছে মত্ত শাল-শিরীষের দল। উথাল-পাথাল হয়ে উঠেছে দিক-জোড়া অন্ধকারের সমুদ্র। আর তারই মধ্যে টর্চের একফালি আলোয় পথ চিনে চিনে চলছে বর আর বধূ। এ কোন্ সর্বনাশা বিবাহ-যাত্রা ?

পাহাড়ী ঢালু পথটা নামতে নামতে এক জায়গায় হু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডাইনের পথ ক্রমশ সেঁধিয়ে গেছে রংডুরির জঙ্গলে। সেই পথ ধরল অমরনাথ

শাল-শিরীষের বিশাল জঙ্গল। লতার ঝোপ আর বুনো আগাছায় ভর্তি। মাঝে মাঝে এত নিবিড় যে ঝড়ও পৌছয় না সেখানে। পায়ে চলা শুঁড়ি-পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের আরও গভীর গহনে। টর্চের আলোয় সেই পথ চিনে চিনে চলেছে অমরনাথ আর সুমিতা। আকাশ-বাতাস বলছে, রাত আর বাকি নেই। চলে চল। লগ্ন যেন পার হয়ে না যায়।

সেই অরণ্য-পথের হু'পাশে ওৎ পেতে আছে পৃথিবীর আদিম হিংসা। বুনো ঘাসের তলায় ময়ালের হাঁ, গাছের আড়ালে ভাল্লুকের

থাবা, লতাঝোপের পেছনে বাঘের ফস্‌ফরাস্‌ চোখ। এমন ভয়ঙ্কর পথে মানুষ যায় কখনও ?

তবু চলেছে সুমিতা আর অমরনাথ হাত ধরাধরি করে। প্রাচীন অরণ্যের বুকে নবীন যাত্রী দুটি। ভয় নেই, ডর নেই। সুমিতার পায়ে পায়ে নববধূর ললিত চলা নেই, আছে সবল দৃঢ় পদক্ষেপ। বুনো ঝোপের কাঁটায় আটকে যাচ্ছে বেনারসীর আঁচল, ভ্রূক্ষেপ নেই। বেতঝাড়ের আড়ালে কি যেন নড়ে উঠল, দৃষ্টি নেই সেদিকে। কোথায় ককিয়ে কেঁদে উঠল শকুনের বাচ্চা—খেয়াল নেই। শুকনো শালের পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সুমিতা মুখে বিচিত্র হাসি, চোখে সেই অদ্ভুত মায়াবী দৃষ্টি। আর তারই হাত ধরে সম্মোহিতের মত এগিয়ে চলেছে অমরনাথ, যে অমরনাথ দিনের বেলাতেও রাইফেল ছাড়া এ-পথে পা দেয় না। জঙ্গলের শুঁড়ি-পথ এঁকেবেঁকে ক্রমশ এগিয়ে হঠাৎ হারিয়ে গেছে শুকনো পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে। বর্ষায় ভেসে যায়, এখন শুধু নুড়ি পাথরের রাশি।

সেইখানে এসে থমকে দাঁড়াল অমরনাথ। হাতের টর্চ ঘুরিয়ে ফেলল বাঁদিকে একটা গুহার মধ্যে ; গুহা ঠিক নয়, বড় গোছের একটা ফাটল। পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে এগিয়ে গেল দু'জনেই।

ফাটলের মধ্যে নাগাদের দেবী প্রতিমা। টক্‌টকে সিঁদুর মাখানো পাথরের মূর্তি একটা। অনেকটা চামুণ্ডা-মূর্তির মত। শুধু মুখটি ছাড়া প্রতিমার গড়ন খুব সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য ভীষণ সেই মুখ। টক্‌টকে লোল জিহ্বা, আকর্ণ বিশাল দু' চোখে বন্য হিংসার চাউনি। হিংসার রাজ্য এই অরণ্যের রাজ্যেশ্বরীই বটে !

রংডুরির পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রী, অসভ্য নাগাদের আরাধ্য দেবী।

ফাটলের সামনে একটা বড় পাথরের টুকরোতে কালো কালো দাগ লেগে আছে। অনেক বলির অনেক রক্তের শুকনো দাগ।

কতদিন দেখেছে অমরনাথ এই অদ্ভুত কলীমূর্তিকে। নাগা কুলীদের সঙ্গে কাজ করতে করতে, কখনও বা শিকারের আশায় রাইফেল ঘাড়ে একা ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর মনে হয়নি কখনও।

অমরনাথ একবার তাকাল সুমিতার মুখের দিকে। সে-মুখে ভয়ের কোন চিহ্নই নেই। পথের কাঁটায় বেনারসীর আঁচল ছিন্নভিন্ন, যত্নে বাঁধা চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, চলতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে সীঁথিমৌর। তবু মোছে নি কপালের চন্দনলেখা, ছিঁড়ে যায়নি গলার গোড়ে হার। ফাটলের ভেতরে মূর্তির সামনে কে জ্বেলে দিয়ে গেছে একটা মশাল। ঝোড়ো হাওয়ার কবল থেকে কোনমতে বেঁচে এখনও জ্বলছে সেটা। তারই লালচে কাঁপা আলো পড়েছে সুমিতার মুখে। প্রাচীন কালের কোন ব্রোঞ্জ মূর্তির মত দেখাচ্ছে সুমিতাকে। যেন আজকের পৃথিবীর কেউ নয়। স্থির হয়ে আছে চোখের তারা চামুণ্ডা মূর্তির দিকে। কাঁপছে না চোখের পলক।

অমরনাথের কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আবছা গলায় ডাকলে সুমিতা!

ব্রোঞ্জের মূর্তিতে প্রাণ ফিরে এল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুমিতা। সে-দৃষ্টিতে লজ্জা, অনুরাগ, প্রণয় ঝরে পড়ছে। চিকৃচিকে কালো চোখের তারায় সেই রহস্য, ঠোঁটের কোণে সেই ব্যঞ্জনা। অমরনাথ এক নিমিষে চিনতে পারল—সেই সুমিতা, যে সারাটা জীবন অপেক্ষা করে থাকবে তারই জন্যে।

আশ্চর্য মধুর গলায় প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে সুমিতা বলতে লাগল, সাক্ষী রইল আকাশ, বন আর ওই দেবীমূর্তি, আজ থেকে

তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। ওই দেবীমূর্তির পা থেকে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দাও আমার মাথায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই অমরনাথ সুমিতার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিল।

সুখে, আনন্দে, বিহ্বলতায় অপরূপ হয়ে উঠল সুমিতার বধূ-মুখ ছিন্ন বেনারসীর আঁচল গলায় জড়িয়ে প্রণাম করলে অমরনাথকে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, একটি সত্যি করো আমার কাছে।

অমরনাথ বললে, কি?

বল যে তুমি আমার, আমারই থাকবে। এই জন্মে, পরজন্মে, চিরজন্মে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই কথাটা বলে গেল অমরনাথ। সুমিতা বললে, এসো, প্রণাম করি দেবীকে।

হাঁটু গেড়ে পাশাপাশি বসল অমরনাথ আর সুমিতা। তারপর একসঙ্গে মাটিতে মাথা ঠেকালো।

ঝড় তখম থেমে এসেছে। শেষ রাতের আকাশ থেকে নীল কালির কষের মত গলে গলে পড়ছে নীলাভ অন্ধকার। ভোর হতে আর বাকি নেই।

গল্পটা এখানেই শেষ করলে মন্দ হতো না। মামুলী হলেও একটা রোমান্সের গল্প পেয়ে আপনারা কিছুটা খুশি হতেন হয়তো। ভেবে নেওয়া যেত যে তারপর অমরনাথ আর সুমিতা ফিরে এল বাংলোয়। সংসার নামে একটি খেলাঘর পাতলো রংভুরি পাহাড়ের বুকে এবং দিন কাটাতে লাগল কপোত কপোতীর সুখে-স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু গল্পলেখকই গল্পের একমাত্র বিধাতা নয়। বিধাতার ওপরেও আর একজন বিধাতা আছেন। গল্পলেখক শেষ করেন যেখানে, তিনি সুরু করেন সেইখান থেকে। সেই খেয়ালী বিধাতার ওপর কারও হাত নেই। যা ঘটে না, তিনি তাই ঘটান।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেই বন্য দেবীমূর্তিকে একসঙ্গে প্রণাম করলে অমরনাথ আর সুমিতা। কতক্ষণই বা লাগে প্রণাম সারতে!

অমরনাথ মাথা তুললে আগে। পাশে তাকিয়েই হঠাৎ চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। বুকের ভেতরটা একবার ধ্বক্ করে উঠেই যেন স্থির হয়ে গেল।

তার পাশে মাটির ওপর পড়ে আছে মালা-খসা ক'টি যুঁইফুল আর রুপোর একটি কাজললতা। কিন্তু সুমিতা নেই!

আশ্চর্য, গেল কোথায় সুমিতা? এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেতে পারে সে? আর কেনই বা যাবে?

অমরনাথ ডাকলে, সুমি!······

সাড়া নেই। আবার ডাকলে। আরও একবার ডাকলে। সে-ডাকে পাখা ঝটপট করে উঠল রাতচরা পাখি। ওঁয়া-ওঁয়া করে কেঁদে উঠল শকুন-শিশু। বেতঝাড়ের আড়ালে হেসে উঠল হায়না।

অমরনাথের শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নামতে লাগল একটা বরফগলা স্রোত। কোথায় গেল সুমিতা? এমন হঠাৎ কেন গেল? এই তো ছিল দু মিনিট আগে তার পাশে। এই তো পড়ে আছে তার মালা থেকে ঝরে-পড়া 'ফুল—তার খোঁপা থেকে খসে-পড়া কাজললতা। সুমিতা কই? কে নিয়ে গেল কেড়ে সুমিতাকে? ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার পাশ থেকে? হয়ত ওৎ পেতে এসেছিল হলদে-কালো-ছাপওয়ালা কোন পাহাড়ী চিতা, চোখের পলকে তুলে নিয়ে গেছে সুমিতাকে। হয়ত বা ময়ালের নাগপাশে পাকে পাকে নিঃশব্দে জড়িয়ে—

অমরনাথের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা জমে একতাল বরফ হয়ে গিয়েছে। কলের পুতুলের মত হাত বাড়িয়ে সে তুলে নিল ছড়ানো যুইফুলগুলি আর কাজললতাটা। মুখ তুলতেই সোজা চোখ পড়ল বন্য নাগাদের সেই কালীমূর্তির ওপর। টক্‌টকে সিঁদুর-লেপা লোল জিহ্বা। অপলক পাথরের চোখ দুটোতে যেন নিষ্ঠুর জিঘাংসা।

দেখতে দেখতে অমরনাথের রক্তে একটু একটু করে আগুন ধরে গেল। তবে কি দেবীর ছদ্মবেশে ওই দানবীই গ্রাস করেছে তার সুমিতাকে ?

অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল অমরনাথ। তার সামনে সেই বলি দেওয়ার পাথরের টুকরোটা দু হাতে তুলে, প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে দিলে ফাটলের মধ্যে। টুকরো টুকরো হয়ে গেল কালীমূর্তি। আর সেই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের পথে অমরনাথ পাগলের মত ছুটলো চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ঃ সুমিতা ! সুমিতা ! সুমিতা !···

ছুটতে ছুটতে একটা শাল গাছে সজোরে ঠুকে গেল কপালটা। তারপর আর কিছু মনে নেই।

অমরনাথের যখন জ্ঞান হল, তখন বাংলোর বিছানায় সে শুয়ে। নাগা কুলীরা তাকে কুড়িয়ে এনেছিল জঙ্গল থেকে।

কিন্তু সুমিতা গেল কোথায় ? গতরাতে যার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে সে গ্রহণ করেছিল স্ত্রীরূপে ! যার মাথার কাজললতা আর মালার ফুল এখনও রয়েছে তার বালিশের পাশে ! এই রংডুরি পাহাড় কি সত্যিই তাকে গ্রাস করেছে ? না, চিরকালের খেয়ালী মেয়ে সুমিতা একরাত্রির খেলা খেলে আবার ফিরে গেছে কলকাতায় —নিবেদিতা লেনের সেই বাড়িতে ?

টেলিগ্রাম করল অমরনাথ সুমিতার কাকাকে। জবাব এল তিনদিন পরে। টেলিগ্রাম নয়, চিঠি ঃ

'সপ্তাহখানেক আগে বিয়ে স্থির হয়েছিল সুমিতার। বিয়ের রাতে কনের পিঁড়িতে বসে সুমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে-ঘুম আর ভাঙেনি। তার কোলের মধ্যে পাওয়া যায় ছোট একটা বিষের শিশি।'•

সবটাই তাহলে চোখের ভুল! অনিদ্রা-রোগগ্রস্ত অমরনাথের স্বপ্নবিকার। সুমিতা আসে নি। মরা মানুষ কখনও আসে ?

কিন্তু ওই রূপোর কাজললতা আর শুকনো যুঁইফুল ? এগুলো তবে কার ? কে রেখে গেছে ?

—

প্রেম নহে মোর

মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে তাকালেন শিবতোষ। তারপর মোটা লেন্সের চশমাটা কপালের ওপর তুলতেই চোখ দুটো তাঁর একটু ছোট হয়ে এল। ডান হাতের পেন্সিলটা চিবুকে ঠেকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, খুন? না, আমার বাড়িতে নয়। ভুল করেছেন অফিসার।

টেবিলের ওদিকে দাঁড়িয়েছিল দুই ব্যক্তি। একজন দীর্ঘদেহ ছিপছিপে, পরনে ছাই রঙের ফ্লানেল স্যুট। ডান হাতে নিভে যাওয়া একটা তামাকের পাইপ। শব্দ না করে লোকটা হাসল। বলল, ভুল আপনিও করেছেন ডক্টর শিবতোষ। পুলিস-অফিসার আমি নই, আমার সঙ্গী। যদিও পুলিসের সঙ্গেই সম্পর্ক আমার।

শিবতোষ অবাক হলেন। বললেন, তাহলে—আপনি—

স্মিত মুখে লোকটি জবাব দিল, আমার নাম প্রতুল লাহিড়ী। শখ করে কিছু কিছু গোয়েন্দাগিরি করে থাকি!

শিবতোষ কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, ও। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

তেমনি স্মিত মুখে প্রতুল বললে, স্বাভাবিক। কেননা আমি একজন সামান্য ব্যক্তি। তবু যে কারণে আমাকে আসতে হয়েছে, সেটা সামান্য নয়। আপনিই তো ডক্টর শিবতোষ সান্যাল?

শিবতোষ ঘাড় নাড়লেন।

একটা খুন হয়েছে বলে 'আপনার এখান থেকে একটু আগে থানায় ফোন করা হয়েছিল। আমরা তাই এসেছি।

শিবতোষের ঠোঁট দুটো আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড সেই অবস্থায় থাকার পর বললেন, টেলিফোন? আমার এখান থেকে?

প্রতুল আবার প্রশ্ন করলে, আপনি কোথাও ফোন করেন নি?

করেছিলাম, কিন্তু সে তো আমার এক বন্ধুকে! আমার এই রিসার্চের ব্যাপারে।

কোনো খুনের ব্যাপার তাহলে আপনার বাড়িতে ঘটে নি?

হাতের পেন্সিলটা দিয়ে গালের পাতলা দাড়ি একটু চুলকে শিবতোষ বললেন, ঘটলে সবার আগে আমার জানাই স্বাভাবিক নয় কি?

চশমাটা কপাল থেকে নামিয়ে শিবতোষ আবার মাইক্রোস্কোপের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এই সময় প্রতুল দু'পা এগিয়ে এল। একেবারে টেবিলের ধার ঘেঁষে। শিবতোষের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, মাপ করবেন, আপনি তো থাকেন আপনার বাড়ি থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে—এই লেবরেটরীতে। এক্ষেত্রে বাড়িতে কি ঘটছে না ঘটছে, সবার আগে আপনার জানা কি সম্ভব?

শিবতোষ বললেন, সম্ভব বৈকি। আমার স্ত্রী টেলিফোনে সদা-সর্বদাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

কিন্তু আপনার স্ত্রীই যদি হঠাৎ খুন হন?

শিবতোষের চশমা চকিতে আবার কপালের ওপর উঠে গেল। হঠাৎ হা-হা করে শিশুর মত কৌতুকে হেসে উঠলেন তিনি। আর, তাঁর সেই সরল দমকা হাসির আওয়াজে ঘুমন্ত খাঁচার মধ্যে কিচ্‌কিচ্ করে উঠল বাঁদরগুলো, ছুটোছুটি করতে লাগল গিনি-পিগেরা। তেমনি হাসতে হাসতেই শিবতোষ বললেন, আপনার

কল্পনার বাহাদুরী আছে প্রতুলবাবু। আমার স্ত্রী খুন হতে যাবেন কেন ? তিনি মিশরের ক্লিওপেট্রাও নন, ট্রয়নগরের হেলেনও নন। তিনি নিতান্তই এক দরিদ্র বিজ্ঞান-অধ্যাপকের অতি সাধারণ স্ত্রী। তাঁকে খুন করলে মজুরী পোষাবে না কারো।

প্রতুলের গলা অদ্ভুত রকম শান্ত আর কঠিন হয়ে এল। বললে, অন্য সময় হলে আপনার রসিকতা আমি উপভোগ করতাম ডক্টর শিবতোষ। কিন্তু এখন ভাবছি আশ্চর্য, এক ঘণ্টা হয়ে গেল সুজাতা দেবী খুন হয়েছেন, অথচ আপনি এখনও জানেন না ?

শিবতোষের চশমা আবার নাকের ওপর নেমে এল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, কে খুন হয়েছে ?

স্থির গলায় প্রতুল উচ্চারণ করলে, আপনার স্ত্রী সুজাতা দেবী।

শিবতোষের হাত থেকে পেন্সিলটা খসে পড়ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এক-পা এক-পা করে টেবিল ঘুরে প্রতুলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বললেন, রাত দুপুরে আপনি কি ডিটেক্‌টিভ গল্প শোনাতে এসেছেন প্রতুলবাবু ? এক ঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রী খুন হয়েছেন ! এই অপূর্ব তথ্যটি আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন ?

সুজাতা দেবীর শোবার ঘর থেকে। টেলিফোন পেয়ে আপনার বাড়িতেই আমরা গিয়েছিলাম। মনে হল সদর দরজা খুলে রেখে কেউ যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। অথচ আশ্চর্য, সুজাতা দেবীর মৃতদেহ ছাড়া গোটা বাড়িটায় জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। আপনি কি সত্যিই কিছু জানেন না ডক্টর শিবতোষ ?

শিবতোষ কোন জবাব দিলেন না। চশমাটা খুলে লেন্স দুটো ভাল করে মুছে আবার চোখে দিলেন। লেবরেটরীর ঘড়িতে রাত দুটো বাজল। বিড় বিড় করে শুধু বললেন, সুজাতা—খুন—অথচ

এক ঘণ্টা আগেও যে আমরা একত্রে ছিলাম! আজ আমাদের বিয়ের তিথি।

প্রতুল এবার বুঝতে পারলো মৃতের বিছানায় কেন অত ফুল ছড়ানো।

হঠাৎ হিংস্র ভাবে চিৎকার করে উঠলেন শিবতোষ, না, না, এ মিথ্যে—এ মিথ্যে!

তারপর উন্মাদের মত ছুটলেন লেবরেটরীর দরজার দিকে। হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেলল প্রতুল। বললে, শান্ত হবার চেষ্টা করুন ডক্টর। চলুন, সঙ্গে আমিও যাই।

লেবরেটরীর বাইরে কম্পাউণ্ড। শীতের কুয়াশা আর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন শিবতোষ, প্রতুল আর থানার ইন্‌স্‌পেক্টর।

টেবিলের ওপর পড়ে রইল শুধু মাইক্রোস্কোপ আর তারই নিচে কাচের শ্লাইডে একটা মরা গিনিপিগের দু-ফোঁটা রক্ত!

কম্পাউণ্ডের এপাশে লেবরেটরী, ওপাশে বাড়ি। শিবতোষের নিজের তৈরী বাড়ি। মোটা মোটা দেয়াল, বড় বড় খিলান আর ভারি পাল্লা বাসানো চওড়া চওড়া দরজা। দেখলে অষ্টদশ শতাব্দীর স্থাপত্য-শিল্পের কথা মনে পড়ে। অদ্ভুত শিবতোষের রুচি।

প্রতুলের কথাই ঠিক। সত্যই বিশাল সদর দরজার কবাট দুটো খুলে অন্ধকার বাড়িটাই যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কার জন্যে অপেক্ষা করছে।

পকেট থেকে প্রতুল টর্চ বের করলে। আলোর রেখা সোজা গিয়ে পড়ল বাড়ির ভেতরে একটা প্রকাণ্ড কালো রোমশ ভাল্লুকের ওপর। হিংস্র নখ আর দাঁত বার করে দু'হাত তুলে সে দাঁড়িয়ে

আছে দোতলার সিঁড়ির ঠিক মুখেই। সেই দিকে এক পা এগিয়েই প্রতুল একটু থমকে দাড়াল। তারপর শিবতোষের দিকে তাকিয়ে বললে, এমন বিচিত্র প্রহরী বড়-একটা দেখা যায় না। মনে হয় অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করলেই ভাল্লুকটা যেন তার নখ আর দাঁত নিয়ে রুখে দাঁড়াবে। তাই নয় কি?

কোন জবাব না দিয়ে শিবতোষ সিঁড়ি ধরলেন। উঠতে উঠতে প্রতুল আবার প্রশ্ন করলে, শিকারের বাতিক আছে নাকি আপনার।

না। মরা ভাল্লুকটা আমি কিনেছিলাম এক সার্কাস পার্টির কাছ থেকে, নেহাৎ শখের খাতিরে।

দোতলার বারান্দায় শিবতোষ পা দিলেন। দক্ষিণ দিকে সোজা গেলেই শেষ ঘরখানা সুজাতার। আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে বিজলী-বাতির এক ঝলক আলো তেরছাভাবে এসে পড়েছে অন্ধকার বারান্দায়। সেই দিকে তাকিয়ে এবার শিবতোষ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর 'সুজাতা! সুজাতা!' বলে ডাকতে ডাকতে সবেগে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আটকে গেল তাঁর গলার আওয়াজ।

চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে প্রতুল দেখলে, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু-পিঠ চেয়ার সজোরে আঁকড়ে ধরে অপলক চোখে শিবতোষ তাকিয়ে আছেন খাটের দিকে—যেখানে অজস্র গোলাপ আর রজনীগন্ধা ছড়ানো ধবধবে বিছানার ওপর নিঃসাড়ে শুয়ে আছে একটি নারীদেহ।

শিবতোষের তুলনায় বয়স অনেক কম। মনে হয় তিরিশেরও নিচে। তন্বঙ্গী, শ্যামা। পরণে বাসন্তী রঙের দামী একখানা বেনারসী। কপালে চন্দন আর কুমকুমের টিপ। বিয়ের তিথির সজ্জাই বটে। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু

মা হওয়ার আগে পর্যন্ত নারীদেহে যে উগ্র আবেদন থাকে পুরুষের কাছে, এই দেহেও তা পুরো মাত্রায় বিরাজমান। মুখখানা অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে। পুষ্ট ঠোঁট দুটি অল্প খোলা। বাঁদিকের কষ বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মাথার বালিশের ওপর। হঠাৎ খুলে-যাওয়া চোখের তারা দু'টা যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে স্থির হয়ে গেছে। নিটোল মসৃণ একখানি হাত শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরেছে বিছানার খানিকটা চাদর। বুক অবধি টেনে দেওয়া কাশ্মিরী। কাজ-করা শালখানা আর ওঠানামা করছে না।

এই সুজাতা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শিবতোষ সান্যালের তরুণী স্ত্রী। দেখে মনে হয়, যেন শ্বাসরোধ করে' খুন করা হয়েছে!

অপলক চোখে শিবতোষ তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন বিছানার ধারে। সুজাতার লতিয়ে-পড়া হাতটি তুলে নিলেন নিজের দু'হাতের মধ্যে। ঠোঁট দুটো তাঁব কাঁপছে থরথর করে। গলার কাছে কি যেন একটা ঠেলে উঠতে চাইছে, একবার ঢোঁক গিলে চাপবার চেষ্টা করলেন। তারপর খাটের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে বিছানায় মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠলেন শিশুর মত।

প্রতুল সেই শোকাহত প্রৌঢ়ের হল্‌দে সোয়েটার ঢাকা পিঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি ভাবছিল কে জানে! হঠাৎ তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বললে, দেখুন ত' সুজাতা দেবীর গা থেকে কোনো গহনা খোয়া গেছে কিনা।

বিছানায় মুখ গুঁজে ভাঙা গলায় শিবতোষ বললেন, না।

ভিজিটিং শ্লিপে লেখা নামটা দেখেই ডি. সি. বললেন, আসতে বল।

সার্জেণ্ট বেরিয়ে যেতেই প্রতুল নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে একবার তাকাল। বলল, ঠিক সময়েই এসেছেন দেখছি।

একটু পরেই বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সার্জেণ্টের পেছন পেছন যে লোকটি দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন, প্রতুল লক্ষ্য করল, কানের দু'পাশের চুলে রুপোলি ছাপ ছাড়াও প্রৌঢ়ত্বের আর একটি চিহ্ন তাঁর চেহারায় আজ দেখা যাচ্ছে। মাঝারি লম্বা দেহটা এক রাতের মধ্যেই কুঁজো হয়ে পড়েছে। তাই বোধ হয় হাতে রুপো বাঁধানো একগাছা লাঠি। খড়্গনাসা, গৌরবর্ণ মুখে কাঁচাপাকা পাৎলা দাড়ি, পরনে ল ক্লথের আধময়লা পায়জামা আর ঢিলে আস্তিন পাঞ্জাবী। গলায় জড়ানো সাদা পশমের কম্ফার্টারের অবস্থাও তথৈবচ।

ঘরের ভেতর এসে ভদ্রলোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের নিচে পুরু লেন্সে ঢাকা চোখ দুটোতে সকরুণ বিষাদ লেগে আছে। সমগ্র মুখে শিশুর মত সরল অসহায়তা।

প্রতুল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সসম্ভ্রমে বললে, আসুন ডক্টর শিবতোষ। আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। বসুন।

একটা চেয়ার টেনে নিলেন শিবতোষ। ডি· সি-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল প্রতুল ঃ সাউথের ডি· সি· মিস্টার রায়চৌধুরী।

চশমাটা কপালের ওপর তুলে শিবতোষ তাকালেন। তারপর

হাত জোড় করে নমস্কার জানাতেই চশমাটা আবার নেমে এল নাকের ওপর।

প্রতুল বললে, ডক্টর সান্যালকে একটু সময় দিন মিষ্টার রায়চৌধুরী। ওঁকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

শিবতোষ হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, ঠিক ক্লান্ত নয়, লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে আমার আসা এই প্রথম কিনা। তাই—

ডি, সি, বললেন, কর্তব্যের খাতিরেই আপনাকে এখানে ডাকতে হয়েছে। নইলে কষ্ট দিতাম না।

কষ্ট আর কি! যা জানতে চান বলুন।—একটু নড়ে চেয়ারে স্থির হয়ে বসলেন শিবতোষ। অপেক্ষা করতে লাগলেন ডি. সি-র প্রশ্নের।

টেবিলে কনুই রেখে ডি সি. একটু ঝুঁকে পড়লেন শিবতোষের দিকে। বললেন, আচ্ছা, শুনেছি আপনি একটু বেশি বয়েসে বিবাহ করেছেন!

শিবতোষ উচ্চারণ করলেন, হ্যাঁ।

কত বয়েসে?

আটচল্লিশ।

এত বেশি বয়েসে বিবাহে আপনার মন হল কেন?

ধীরে ধীরে শিবতোষ বললেন, প্রেম কখনও জীবনে হিসেব করে' আসে না। কখনও আসে বসন্তে, কখনও বা শীতে। আমার জীবনে এসেছিল যখন আমার বসন্তকাল পার হয়ে গেছে। তবু একদিন ফুল ফুটলো, বইলো দক্ষিণ বাতাস, গাইলো পাখি। এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল শুধু সুজাতার জন্যে। সুজাতা ছিল আমার প্রিয় ছাত্রী। বছরের পর বছর তাকে পড়িয়েছি, কিন্তু ভাল করে দেখিনি তাকে। দিনের পর দিন সে আসত আমার লেবরেটরীতে।

আমার রিসার্চ সম্বন্ধে কত কথাই তাকে বলেছি। যেমন করে বলতাম আমার আর পাঁচটি ছাত্রকে। কিন্তু একদিন, এক বৃষ্টির রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সুজাতা শুধু আমার ছাত্রী নয়, সুজাতা চিরকালের নারী। বছরের পর বছর যে বসন্তকাল আমার লেবরেটরীর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ফিরে গেছে, সেই বসন্তকাল যেন চক্রান্ত করে ফিরে এল আমার জীবনে, সেই বৃষ্টির রাতে। বুড়ো বয়েসে ভালবাসলাম সুজাতাকে। বিয়ের প্রস্তাবও করলাম। দু'বছর আগের কথা বলছি। তখন আমার বয়েস পুরো আটচল্লিশ।

আর সুজাতা দেবী?

ছাব্বিশে পা দিয়েছে তখন।

সুজাতা দেবীও কি আপনাকে ভালবেসেছিলেন? ডি সি. প্রশ্ন করলেন।

কয়েক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন শিবতোষ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, প্রশ্নটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মিষ্টার রায়চৌধুরী।

কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবের ওপর কেসটা অনেকখানি নির্ভর করছে ডক্টর।

বেশ, তবে শুনুন। সুজাতাও আমাকে গভীরভাবে ভাল-বেসেছিল।

মাপ করবেন। আপনি কি ঠিক জানতেন?

শিবতোষের মুখে এবার একটু ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন: জানতাম বৈকি! স্বামী হয়ে স্ত্রীর মন জানব না?

কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের বয়েসের তফাৎটা কতখানি।

মুখে তেমনি হাসি নিয়ে শিবতোষ বললেন, বলেছি তো প্রেম কখনও হিসেব করে আসে না। তার কাণ্ডই বিচিত্র। সেদিন

সেই বৃষ্টির রাত যখন সুজাতার নারীত্বকে জাগিয়েছিল, তখন তার সামনে শুধু আমিই ছিলাম। কাজেই আমাকে ভালবাসতে তার দেরী হয়নি।

আপনাদের দাম্পত্য-জীবন তাহলে সুখেরই ছিল ?

যতদূর সুখের হওয়া সম্ভব।

হঠাৎ কোণ থেকে উঠে এল প্রতুল। বললেঃ আপনার অনুমতি নিয়ে ডক্টর শিবতোষকে একটা প্রশ্ন করছি মিস্টার রায়চৌধুরী।

তারপর শূন্যগর্ভ তামাকের পাইপটা এক হাত দিয়ে অপর হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বলল, আচ্ছা ডক্টর, মাধোলাল বলে কাউকে আপনি চেনেন ?

শিশুর মত সরল চোখ ছুটি তুলে শিবতোষ বললেন, চিনব না কেন ? সেও আমার এক অতি প্রিয় ছাত্র।

এই মাধোলালের সঙ্গে কি সুজাতা দেবীর পরিচয় ছিল ?

ছু'জনেই যখন আমার ছাত্র, তখন পবিচয় থাকাই স্বাভাবিক।

কতটা পরিচয় ছিল ?

ছু' সহপাঠির মধ্যে যতটা থাকা উচিত।

তার বেশী নয় ?

না।

কিন্তু আমরা শুনেছি মাধোলাল এবং সুজাতা দেবীর পরিচয় সহপাঠির গণ্ডী ছাড়িয়ে রীতিমত ঘনিষ্ঠতায় পৌছেছিল।

পলকে শিবতোষের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল। ঘন ভ্রূ জোড়া এল কুঁচকে। চশমাটা কপালের ওপর টেনে দিয়ে বলে উঠলেন, সুজাতা আমার স্ত্রী। তার সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই প্রতুলবাবু।

আমি ছুঃখিত ডক্টর।

অনুশোচনায় প্রতুল যেন কুঁকড়ে গেল। তারপর পকেট থেকে ভাঁজকরা একতাড়া লেটার পেপার বের করে শিবতোষের দিকে এগিয়ে ধরল, বললে : আচ্ছা, দেখুন তো, হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

চশমাটা আবার নাকের ওপর নামিয়ে শিবতোষ চিঠির তাড়া খুললেন। ইংরেজিতে লেখা ছোট ছোট চিঠি। সেগুলির ভাবার্থ হল এই :

প্রিয়তমাষু—

এই সম্বোধনের অধিকার তুমি নিজেই দিয়েছিলে, আবার নিজেই কেড়ে নিয়েছ। কিন্তু যে-অধিকারকে মানুষের অন্তর স্বীকার করে নেয়, সে-অধিকার কেড়ে নিলেও যায় না। পরের ঘরে গেলেও আজও তুমি আমার—আমার—আমার ! চিরকাল আমারই থাকবে।

শিবতোষ দ্বিতীয় চিঠি খুললেন :

আমার পরম প্রিয় শত্রু,

ভগবান বলে যদি সত্যিই কেউ থাকেন, তাঁর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা—তোমাকে যেন আমি ভুলতে পারি। ভালোবাসার নামে আমাকে শুধু তুমি বঞ্চনাই কর নি, আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তুমি বিষাক্ত করে তুলেছ তোমার বঞ্চনার দ্বারা। আমি ভাবতেও পারছিনা যে, একই আকাশের তলায় তুমি আর আমি রয়েছি, অথচ আমরা কেউ কারো নই। এভাবে দিন কাটানো অসম্ভব সুজাতা। এ জগৎ ছেড়ে অন্য জগতে হয় আমি চলে যাই, না হয় তুমি চলে যাও।

পরের চিঠি :

আমার জীবনের মরীচিকা,

কেন ডাকো আমায় ? একি তোমার খেলা ? না ; আমার

জন্যে তোমার মনে একদিন যে সুধা সঞ্চিত হয়েছিল, আজও তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি বলেই আমাকে ডাকো? তুমি জান যে তোমার ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই। অথচ তোমাকে সেই আগের সুজাতা বলে ভাবব, সে-সাধ্যও বা কই আমার? মনে হয়, এক বৃদ্ধ অজগর যেন তোমাকে সবসময় পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে! আর সেই নাগপাশের আবেষ্টনে তোমার প্রেম মুক্তির জন্যে ছটফট করছে। আমি তোমায় মুক্তি দেব সুজাতা। স্বপ্নে জাগরণে আমার শুধু সেই চিন্তা, কেমন করে আমি তোমায় মুক্তি দেব।

তারপর ঃ

সুজাতা,

তোমাদের বিবাহ-তিথির নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছ। কি করে তুমি এতখানি নির্লজ্জ নিষ্ঠুর হতে পারলে, আমি ভাবতে পারছি না। তোমার স্পর্ধা দেখেও আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমারই সামনে তুমি তোমার বিরাহ-তিথি পালন করতে চাও? তবু তোমার নিমন্ত্রন আমি গ্রহণ করেছি। কেন জানো? তোমার বিবাহ-বাসর আমার কাছে তোমার শ্মশান-বাসর ছাড়া আর কিছু নয়। সেই শ্মশান-বাসর দেখতেই আমি যাব।

আর পড়তে পারলেন না শিবতোষ। সেই অবধি পড়েই চিঠির তাড়া আবার ভাঁজ করে মুড়ে রাখলেন। ভাঁজ করতে গিয়ে শিবতোষের হাত দু'খানা কাঁপছিল থরথর করে। সুগৌর মুখখানা পলকের জন্যে আগুনের মত টক্‌টকে হয়ে উঠেছিল। আবার ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। পিঠটা নুয়ে পড়ল আরও কুঁজো হয়ে। তাঁকে এখন দেখাচ্ছে পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা ঝড়ে বিধ্বস্ত একটা জাহাজের মত। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, কোথায় পেলেন এগুলো?

আপনি জানেন না কোথায় ছিল?

মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে শিবতোষ বললেন, আমি কিছুই জানি না।

সুজাতা দেবীর দেরাজের ড্রয়ার থেকে পাওয়া গেছে—প্রতুল বললে।

শিবতোষের মুখ থেকে অস্ফুট বেরিয়ে এল, আশ্চর্য! আমি এতকাল কিছুই জানতাম না।

শিবতোষের মুখের দিকেই তাকিয়েছিল প্রতুল। প্রশ্ন করলে, হাতের লেখাটা চিনতে পারলেন কি?

শিবতোষ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন।

কার?

যেন অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন শিবতোষ ঃ মাধোলালের।

চিঠির তাড়াটা নিজের পকেটে রাখতে রাখতে প্রতুল বললে, তাহলে দেখা যাচ্ছে মাধোলালের সঙ্গে সুজাতা দেবীর ঘনিষ্ঠতা বিয়ের আগে থেকেই ছিল। তাই নয় কি ডক্টর?

বিহ্বলের মত শিবতোষ বললেন, এখন তাই মনে হয়।

এবার ডি· সি. প্রশ্ন করলেন, গত রাতে আপনাদের বিবাহ-তিথির উৎসবে কে কে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর?

আমার সহকর্মী চারজন প্রফেসর, আর মাধোলাল।

কত রাত অবধি তারা ছিলেন?

প্রফেসরেরা সকলেই রাত সাড়ে দশটায় বিদায় নিলেন। তারপরই টেলিফোন এল মাধোলালের। তার আসতে একটু রাত হবে।

মাধোলাল কখন এসেছিল?

রাত এগারোটা অবধি অপেক্ষা করে আমি আর সুজাতা খাবার টেবিলে বসতে যাচ্ছিলাম, মাধোলাল সেই সময় আসে।

আপনারা একত্রে খেতে বসেন ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

কিছু জরুরি কাজ বাকি ছিল, তাই খাওয়া-দাওয়ার পরই উৎসব থেকে আমি ছুটি নিয়েছিলাম কিছুক্ষনের জন্যে। মাধোলাল গল্প করতে লাগল সুজাতার সঙ্গে। রাত ঠিক সাড়ে বারোটার সময় মাধোলাল আমার লেবরেটরীতে এসে বিদায় চায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, সুজাতা কি করছে। উত্তরে মাধোলাল কেমন যেন একটু হাসলে। বললে, ঘুমোচ্ছে। সুজাতার সেই ঘুম যে আর ভাঙবে না, তা ভাবিনি !

শিবতোষের ভাঙা গলা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর ধাবে ধীরে ডি, সি, বললেন ঃ মনের এই অবস্থায় আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করাই উচিত নয়। কিন্তু পুলিসের কর্তব্য বড় কঠিন। আপনার কি মনে হয় ডক্টর, সুজাতা দেবীকে মাধোলালই খুন করেছে ?

পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে শিবতোষের ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টি একটা ক্যালেণ্ডারের ওপর স্থির হয়েছিল। সেইভাবেই তিনি বললেন, আমি কিছুই বলতে চাই না মিষ্টার রায়চৌধুরী। সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কথাই ফুরিয়ে গেছে। তবে—

শিবতোষের স্থির দেহটা হঠাৎ নড়ে উঠল। ডি· সি -র দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, চিঠিগুলো পড়ে মনে হয় মাধোলাল পাগল হয়ে গেছে। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

প্রতুল এগিয়ে এল শিবতোষের পাশে। কোমল গলায় বললে, অনিচ্ছা সত্বেও আপনাকে আমরা খানিকটা কষ্ট দিলাম ডক্টর, ক্ষমা

করবেন। আপনার প্রশ্নের পালা আশা করি শেষ হয়েছে মিস্টার রায়চৌধুরী ?

ডি. সি. বললেন, হয়েছে। উনি এখন যেতে পারেন।

চলুন ডক্টর, আপনাকে এগিয়ে দিই।

শিবতোষের হাত ধরে প্রতুল তাঁকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলে। তারপর তাঁকে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

নিচে শিবতোষের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। শিবতোষ ওঠবার আগে প্রতুল হঠাৎ বললে, সুজাতা দেবীকে কে খুন করেছে জানা গেলে আপনি কি সত্যিই খুশী হবেন ডক্টর ?

পুরু লেন্সের চশমা চকিতে কপালের ওপর ওঠে গেল। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন শিবতোষ।

কথাটা ঘুরিয়ে নিল প্রতুল। মৃদু হেসে বলল, বেশ শীত পড়েছে আজ। সোয়েটার পরেন নি কেন ? আপনার সেই হলদে রঙের সোয়েটার ?

শিবতোষ বললেন, সুজাতা নেই, কে আর হাতের কাছে এগিয়ে দেবে বলুন !

তা বটে। আচ্ছা, আসুন।

শিবতোষের গাড়ি বেরিয়ে গেল পুলিস-হেডকোয়ার্টার্সের ফটক দিয়ে। এতক্ষণে শূন্যগর্ভ পাইপটায় তামাক ঠাসবার অবকাশ পেল প্রতুল।

মাইক্রোস্কোপের ওপর আর একবার ঝুঁকে পড়লেন শিবতোষ। এই নিয়ে চারবার। আশ্চর্য, কিছুতেই মন বসছে না তাঁর। আশ্চর্য

এই কারণে যে, বিজ্ঞান-তপস্বীর তপস্যা দীর্ঘ আঠারো বছরের মধ্যে এমন করে আর কখনও ভেঙে যায় নি। কোথায় গেল তাঁর সেই কেন্দ্রীভূত অভিনিবেশ? কোথায় গেল তন্ময়তা? এই মাইক্রো-স্কোপ, এই যন্ত্রপাতি, নোটলেখার খাতা—এমন কি এই গোটা লেবরেটরীটাই থেকে থেকে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে। আর বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে উজ্জ্বল, শ্যামল, হাসিমাখা পানের মত একখানি মুখ। সে মুখখানি সুজাতার।

কিন্তু যে নেই, তাকেই বা বারবার মনে পড়ে কেন? সুজাতাকে কি বড় বেশি ভালবেসেছিলেন শিবতোষ? তাই হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যাচ্ছে না সেই মুখখানি?

কিন্তু বিজ্ঞান-তপস্বীর জীবনে হৃদয়াবেগের কোন স্থান নেই। সময় নেই অতীতকে নিয়ে বিলাপ করবার বা বিলাস করবার। দাম নেই অতীত স্মৃতির। যে গেছে, তাকে যেতেই দাও। শিবতোষ তাই আবার ঝুঁকে পড়লেন মাইক্রোস্কোপের ওপর। আর ঠিক সেই সময় লেবরেটরীর স্তব্ধতাকে যেন ধাক্কা দিয়ে নাড়িয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। অভ্যাসবশত হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়েই শিবতোষ বলতে যাচ্ছিলেন, 'হ্যাঁ এই যাই সুজাতা, আর মিনিট দশেক—'

কিন্তু তার আগেই অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল, ডক্টর শিবতোষ আছেন?

কথা বলছি।

সুজাতাকে হারিয়ে বড় একা লাগছে, না? জীবনটা যেন বড় ফাঁকা!

খুব স্বাভাবিক। আপনি কে?

শিবতোষের ম্লান চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠল।

আচ্ছা, এই লেবরেটরীতেই এক বর্ষার রাতে সুজাতাকে আপনি প্রথম কাছে পেয়েছিলেন, না ? মনে আছে নিশ্চয়ই ? ধরুন, আজ এই গভীর রাতে লেবরেটরীর আশেপাশে যখন আপনি ছাড়া কেউ জেগে নেই, সুজাতা যদি তেমনি করে এসে দাঁড়ায় ঠিক আপনার পাশটিতে—আপনার গলার ওপর যদি লাগে তার গরম সুরভিত নিঃশ্বাস—

শিবতোষের ঠোঁট দুটো আচমকা ফাঁক হয়ে গেল। পুরু লেন্সের ভেতর থেকে চকিতে চোখ ঘুরে এল লেবরেটরীর চতুর্দিকে। ফুলে উঠল কপালের শিরা দুটো। প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলেন, এসব কি বলছেন ! কে আপনি ?

অস্পষ্ট হাসির আওয়াজ ভেসে এল টেলিফোন-তারের ওপ্রান্ত থেকে। তার সঙ্গে কথা ঃ ভয় পেলেন নাকি ? যাকে এত ভালবাসতেন, তাকেই এত ভয় ? কিন্তু সুজাতা আসবে—আসবেই আপনার কাছে। কেন জানেন ? তাকে যে খুন করেছে, তার নামটা আপনার মুখ থেকেই শোনবার জন্যে।

গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠলেন শিবতোষ, কে আপনি—কে ?

অপর প্রান্ত থেকে জবাব এল, মাধোলাল।

তারপরেই টেলিফোন কেটে দেওয়ার আওয়াজ।

রিসিভারটা হাতে ধরে হতচেতনের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন শিবতোষ। শীতের রাতেও কপালে তাঁর দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পুরু লেন্সের ভিতরে পলক পড়ছে না দুটো চোখে। পাগল হয়ে গেছে মাধোলাল, নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু গভীর নিশীথে পাগল মাধোলালের একি পাগলামির খেলা ?

হঠাৎ চমকে উঠলেন শিবতোষ। কিসের আওয়াজ ? না,

সুজাতা নয়। লেবরেটরীর এককোণে রাখা একটা খাঁচার মধ্যে অস্থিরতা জেগেছে। কলরব করছে বাঁদরগুলো।

ময়না-তদন্তের রিপোর্ট এল পরদিন।

জানা গেল, ঘুমন্ত অবস্থায় সুজাতার নাকে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করানো হয়। তারই ফলে হৃদস্পন্দন থেমে যায়। স্প্রীং কেটে গেলে ঘড়ি যেমন হঠাৎ অচল হয়ে পড়ে। হঠাৎ দম বন্ধ হওয়ার ফলে সুজাতার দেহের কয়েকটি রক্তকোষ ফেটে ভেতরে ভেতরে প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছিল।

মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সুজাতার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

রিপোর্টখানা ডি, সি-র হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে প্রতুল প্রশ্ন করলে, এরপর কি করতে চান ?

মাধোলালের নামে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে বলুন ?

আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই, মিস্টার রায়চৌধুরী।

হেতু ?

তামাকের পাইপটা নিভে গেছে :অনেকক্ষণ। মুখ থেকে সেটা নামিয়ে প্রতুল বললে, ধরুন, সুজাতা সান্যালকে যদি মাধোলাল খুন করে না থাকে ? কি করবেন তাকে অ্যারেষ্ট ক'রে ?

তাহলে কে খুন করেছে বলে আপনি সন্দেহ করেন ?

মৃদু হেসে প্রতুল বললে, সে-কথা পরে আসছে। তার আগে বলুন, মাধোলাল যদি খুনী না হয়, তাহলে কি করবেন ?

খুনের আগের ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়ে দেখলে সন্দেহটা কি

মাধোলালের ওপরেই পড়ে না? তার শেষ চিঠিখানায় হত্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই কি? এই দেখুন না—

মাধোলালের চিঠির তাড়া থেকে শেষ চিঠিখানার একটা লাইন ডি, সি, পড়লেন,—'তোমার বিবাহ-বাসর আমার কাছে তোমার শ্মশান-বাসর ছাড়া আর কিছু নয়। সেই শ্মশান-বাসর দেখতেই আমি যাব!' সুতরাং সুজাতা সান্যালের বিয়ের 'তিথিতে যে' মাধোলাল হত্যার মোটিভ নিয়ে গিয়েছিল, এমন সন্দেহ করা কেন অন্যায় হবে প্রতুলবাবু?

ডি, সি-র গলার আওয়াজ উত্তেজিত মনে হল। প্রতুল কিন্তু তেমনি শান্ত স্মিতমুখে বললে, সন্দেহ আর প্রমাণ তো এক জিনিস নয় মিস্টার রায়চৌধুরী। আপনি কেস খাড়া করবেন কিসের ওপর? সাক্ষী কে?

কি যেন বলতে গিয়ে ডি. সি. হঠাৎ থেমে গেলেন। মনে মনে হয়তো প্রতুলের প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে হয় প্রতুলবাবু?

ডান হাতে তামাকের পাইপটা ধরে বাঁ-হাতের তালুতে মৃদু মৃদু ঠুকতে ঠুকতে প্রতুল বললে, আমার মনে হয় সুজাতা-হত্যার রহস্য পৃথিবীতে জানে শুধু দু'জন।

কারা?

একজন হচ্ছে ডক্টর শিবতোষের বাড়িতে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সদাজাগ্রত প্রহরী, অর্থাৎ সেই নখ-দাঁতওয়ালা মরা ভাল্লুক।

আর?

আর জানেন ডক্টর শিরতোষ নিজে।

প্রতুলের কপালে আস্তে আস্তে দু-তিনটে রেখা ফুটে উঠল।

কতকটা আপন মনেই বললে. কিন্তু তিনি কি আমাদের বলবেন!

চিন্তার রেখা ডি· সি·'র মুখেও দেখা দিয়েছিল। পেন্সিল দিয়ে প্যাডের ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি করা যায় এখন?

প্রতুলের মুখের সামনে কে যেন দপ করে আলো জ্বেলে দিল। আশ্বাসভরা গলায় বলে উঠল, নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই মিস্টার রায়চৌধুরী। খুনী কে, তা সেই ভাল্লুক-প্রহরীই আমায় জানিয়েছে। এখন ডক্টর শিবতোষ যদি তাঁর কথা সমর্থন করেন, তবেই ধাঁধাঁর উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু—(প্রতুলের কপাল আবার কুঁচকে এল) ডক্টর শিবতোষ বলবেন কি? দেখি চেষ্টা করে।

* * * *

সেদিন রাতে আবার বেজে উঠল টেলিফোন। বেজে উঠল সুজাতার শোবার ঘরে। রাত তখন অনেক।

একদাগ ব্রোমাইড মিক্সচার খেয়ে শুয়েছিলেন শিবতোষ। ব্রোমাইড খেয়ে শোবার অভ্যাস সুজাতা বেঁচে থাকতেই তাঁর ছিল। সুজাতা মারা যাওয়ার পর ডোজটা বেড়েছে মাত্র। ক্রিং ক্রিং শব্দ হতেই অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে পাশের টিপয় থেকে রিসিভার তুলে নিলেন শিবতোষ।

টেলিফোনের ওপার থেকে কথা ভেসে এল, ডক্টর শিবতোষ?

হ্যাঁ।

এখনও জেগে আছেন?

হ্যাঁ।

সুজাতা সব ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে, না? কিন্তু হাত বাড়িয়ে দেখুন, সুজাতা আপনার পাশেই শুয়ে—মৃদু নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছেন না?

চকিতে শিবতোষের বাঁ-হাতখানা বেড-সুইচের বোতাম টিপলো। ফিকে নীল আলোয় ভরে গেল ঘর।

না, শিবতোষের পাশে কেউ নেই। অর্ধেক বিছানাটা খালিই পড়ে আছে। শোয়ার আগে যেমন ছিল। অথচ—মনে মনে লজ্জিত হলেন শিবতোষ—দু' সেকেণ্ড আগেও তিনি যেন সত্যিই একটি পরিচিত নারীদেহের উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করেছিলেন, শুনতেও পেয়েছিলেন মৃদু নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

ভয় ঠিক নয়, মরা সুজাতার অস্তিত্ব এখনও তাঁর চেতনায় মিশে আছে বলেই এমন ভুল আজকাল প্রায়ই ঘটছে শিবতোষের। কিন্তু এই ভুলের সুযোগ নিয়ে এক উন্মাদের একি নিষ্ঠুর খেলা!

রিসিভারে মুখ রেখে শিবতোষ বলে উঠলেন, মাধোলাল, তোমায় মানা করছি, এমন করে অশান্তি ঘটিও না। তোমার পাগলামিকে আর আমি ক্ষমা করব না।

বিচিত্র হাসির সঙ্গে সঙ্গে তারের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল কথা: সুজাতাকে খুন করেছে কে, না বললে অশান্তি আপনার জীবনেও যাবে না।

কে খুন করেছে, আমি জানি না।

আপনিই জানেন।

শিবতোষের চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে উঠল। গলার আওয়াজ গেল বদলে। বললেন, আমি তোমায় শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি মাধোলাল, এমন করে আমার শান্তিভঙ্গ করো না, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছু বলবও না।

তারের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল সেই বিচিত্র হাসি: না বলে আপনার উপায় নেই ডক্টর। সে আপনাকে বলাবেই।

কে?

সুজাতা। যতদিন না বলবেন, ততদিন সে ছায়ার মত আপনার পিছু পিছু ঘুরবে। তার আত্মা কিছুতেই রেহাই দেবে না আপনাকে —কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে কেবলই বলতে থাকবে : বল, বল, বল!

মাধোলাল! গর্জে উঠে শিবতোষ রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। কপালের রগ দুটো তাঁর ফুলে উঠেছে তখন। একটা ঠাণ্ডা অনুভূতির স্রোত নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। ত্বরিতে খাট থেকে নেমে ঘরের সব ক'টি বাতি দিলেন জ্বালিয়ে। তারপর আবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়েল করলেন একটা নম্বর। তারপর এক নিঃশ্বাসে বললেন, হ্যালো, প্রতুলবাবু! আমি শিবতোষ সান্যাল। মাধোলালকে অ্যারেষ্ট করুন। সুজাতাকে সে-ই খুন করেছে। বলতে আমি চাই নি, কিন্তু—

রিসিভারটা সশব্দে রেখে দিয়ে শিবতোষ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকার বারান্দায়।

সুজাতার স্মৃতি কি সত্যিই তাড়া করেছে তাকে?

বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি। সিঁড়িও অন্ধকার। সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই চমকে উঠলেন শিবতোষ। দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে। কে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির গোড়ায়? সুজাতা?

অন্ধকারেই দেয়াল হাতড়ে সিঁড়ির বাতির সুইচ টিপলেন।

না, সুজাতা নয়। সিঁড়ির গোড়ায় দু' হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভাল্লুক প্রহরী।

ল্যান্সডাউন দিয়ে যেতে যেতে ছোট মরিস গাড়িখানা সাঁ করে এলগিন রোডে বেঁকে গেল। তারপর বাঁ দিকে লোহার একটা ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পোর্টিকোর আলোর ঠিক নিচেই দাঁড়িয়েছিল একটি দীর্ঘাকায় মূর্তি। মুখে পাইপ। স্বভাব-গম্ভীর গলায় বললে, আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি এসেছেন ডক্টর।

গাড়ি থেকে নেমে শিবতোষ বললেন, আপনার ফোন পেয়েই বেরিয়ে পড়েছি প্রতুলবাবু। কি ব্যাপার বলুন তো?

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে প্রতুল স্মিতমুখে বললে, সবই বলব। আগে ভেতরে চলুন। আমার বাড়িতে যখন এলেনই দয়া করে, তখন কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এই শীতের সন্ধ্যায় শরীরটাকে একটু গরম করে নিন।

প্রতুলের সঙ্গে হলঘরে এসে বসলেন শিবতোষ। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন ডি. সি.। এল কফি। একটা চুমুক দিয়ে প্রতুল তাকাল শিবতোষের দিকে। কোমল গলায় বললে, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। সারাদিন লেবরেটরীতেই ছিলেন?

চশমার লেন্স দুটোয় গরম কফির ধোঁয়া লাগিয়ে রুমাল দিয়ে মুছছিলেন শিবতোষ। বললেন, আজকাল লেবরেটরীতে বড় থাকি না। সুজাতা বেঁচে থাকতে যে এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করেছিলাম, সেটা ছেড়েই দিয়েছি। কি আর হবে! সুজাতাকে বাদ দিয়ে সবকিছুই আমার জীবনে আজ অর্থহীন।

এক মনে লেন্স মুছতে লাগলেন শিবতোষ। ডি. সি. আর প্রতুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, দুটো দিনের মধ্যেই শিবতোষ যেন

আগের চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছেন। কুঁজো হয়ে পড়েছেন আরও খানিকটা। শুকনো মুখের চামড়া কুঁচকে এসেছে। সে-মুখে যেন ভেতরকার একটা অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

ডি. সি. বললেন, আপনার কি অসুখ করেছে ডক্টর সান্যাল?

শিবতোষ বললেন, ঠিক অসুখ নয়, তবে শরীরটা ক'দিন ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু কি-জন্যে আমায় ডেকেছেন বললেন না তো?

ডি. সি বললেন, মাধোলাল ধরা পড়েছে!

মাধোলাল! শিবতোষের নুয়ে-পড়া দেহটা দেখতে দেখতে সোজা হয়ে উঠল। পুরু লেন্সের ভেতরে চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রশ্ন করলেন, কখন ধরা পড়েছে?

পাইপে টান দিয়ে প্রতুল বললে, এই তো কিছুক্ষণ। সন্ধ্যে হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে। কাল আপনার ফোন পেয়ে শেষ রাত থেকেই ওকে আমরা খুঁজছিলাম। দু'দিন ধরে হোস্টেলে ও যায় নি। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল গঙ্গার ধারের এক জেটিতে।

ধীর স্বরে শিবতোষ উচ্চারণ করলেন, কোথায় সে এখন?

ওপরে।

শিবতোষের চোখে বিস্ময় দেখা দিল। বললেন, থানার বদলে মাধোলাল আপনার বাড়িতে কেন প্রতুলবাবু?

আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করতে চায়, তাই।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ। কি যেন গোপন কথা আছে ওর। কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ডক্টর।

কফির পেয়ালাটা তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখলেন শিবতোষ। বললেন, আমার সঙ্গে ওর কোন কথাই থাকতে পারে না প্রতুলবাবু।

একটা উন্মাদের সঙ্গে একজন প্রকৃতিস্থ লোকের কোন কথা থাকাই সম্ভব নয়।

তবু একবার দেখা করা দরকার, ডক্টর। কেননা, মাধোলাল আপনার পুরোনো ছাত্র। তাছাড়া ঘটনার দিন পর্যন্ত আপনার বাড়িতে তার যাতায়াত ও মেলামেশা ছিল। এক্ষেত্রে আপনার সনাক্তকরণ আর জবানবন্দী—ছুটোই দরকার।

শিবতোষ বললেন ঃ বেশ, জবানবন্দী লিখে নিন।

সেটা পরে। আগে ওপরে চলুন, যে ধরা পড়েছে সে সত্যিই মাধোলাল কিনা দেখে বলুন।

হলের একপাশ দিয়ে দোতলায় ওঠাব সিঁড়ি। তিনজনে সেইদিকে এগোলেন। প্রথমে প্রতুল, মাঝে শিবতোষ, পেছনে ডি. সি.। দোতলায় উঠে পশ্চিমের শেষ ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনজন। এ ঘরখানা বাড়ির একেবারে পেছন দিকে, একটা পুরোনো বাগানের ঠিক ওপরেই। এদিককার আবহাওয়াটাই কেমন যেন নিঝুম, থম্‌থমে।

পশ্চিমের শেষ ঘরখানার দরজা ভেজানো। গলা নামিয়ে প্রতুল বললে, এই ঘরেই আছে সে। আপনি ভেতরে যান। আমরা বাইরেই থাকি। আপনাদের গোপন কথায় আমাদের না থাকাই ভাল!

শিবতোষ দরজা ঠেলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্রতুল আবার বললে, হ্যাঁ, একটা কথা। সন্ধ্যে থেকে ওর কি যে হয়েছে, কিছুতেই আলো জ্বালতে চাইছে না। পাগলের খেয়াল হয়ত! দরজার বাঁ দিকে সুইচ, দরকার হলে আপনি জ্বেলে নেবেন।

দরজা ঠেলে আস্তে আস্তে ভেতরে পা দিলেন শিবতোষ। বাস্তবিকই তাই। ঘর অন্ধকার।

বাগানের দিকে জানলা ঘেঁষে একটা সোফায় বসে আছে নিশ্চল একটি মূর্তি। কুয়াশা-মাখা অল্প জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্‌ করছে শুধু তার মাথার পেছনটা আর কাঁধের পাশ।

ঘরে পা দিয়ে শিবতোষ আশা করছিলেন ব্যাকুল বিহ্বল মাধোলাল উন্মাদের মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর পায়ের ওপর। বলবে,—আমাকে বাঁচান। কিন্তু না, মাধোলালের মূর্তি একটু নড়ল না পর্যন্ত।

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেন শিবতোষ। ডাকলেন, মাধোলাল!

কোন সাড়া নেই।

মাধোলাল ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? খুনের দায়ে ধরা পড়েও লোক ঘুমোতে পারে? আশ্চর্য!

আবার ডাকলেন শিবতোষ, মাধোলাল!

এবারও কোন সাড়া নেই। স্থির হয়ে বসে আছে মাধোলালের মূর্তি।

শিবতোষের একখানা অসহিষ্ণু হাত বাঁ দিকের দেওয়াল লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। তারপর আওয়াজ হল 'খুট'। আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেতে গিয়েও একটা আলমারি ধরে ফেললেন শিবতোষ।

উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ঘর ভেসে গেছে। আর সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে বাগানের জানলা ঘেঁষে সোফার ওপর যে বসে আছে, সে মাধোলাল নয়—সুজাতা!

চশমাটা কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে শিবতোষ একবার ভাল করে তাকালেন। হ্যাঁ, সুজাতাই। মরা সুজাতা। সোফার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে সোজা বসে আছে। পাতাখোলা দুটো চোখের দৃষ্টি দিয়ে নির্নিমেষে দেখছে শিবতোষকে। দেখছে, হঠাৎ তাকে দেখে

ভয়ে আর আতঙ্কে কেমন বিভ্রান্ত, হতচকিত হয়ে পড়েছেতার স্বামী।

কিন্তু হতচকিত হওয়ার কথা নয় কি? সুজাতা'ছিল তো মর্গে। এখানে কে আনল? কেন আনল?

অপলকে তাকিয়ে আছে সুজাতা। পলক নড়ছে না শিবতোষের চোখেও। চেয়ে আছেন সুজাতার মুখের পানে। ফ্যাকাশে নীল মুখ, ফোলা ফোলা। একখানা হাত কোলের ওপর আলগা ভাবে আর একখানা হাত সোজা হয়ে ঝুলছে সোফার পাশে। নীরক্ত আঙুল-গুলোও ফোলা। রুক্ষ চুলের বেণীটি বুকের ওপর দিয়ে লুটিয়ে আছে। গাঢ় নীল ঠোঁট দুটো এখনও তেমনি অল্প ফাঁক। ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকে গেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে মরা সুজাতা অপলকে দেখছে কেমন বিহ্বল আর হতচকিত হয়ে পড়েছে তার স্বামী।

নিজের অজান্তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন শিবতোষ। আর একটু হলেই তিনি চীৎকার করে উঠতেন। কিন্তু তার আগেই ঘরের ভেতরে কে যেন হঠাৎ বলে উঠল, ডক্টর শিবতোষ! সুজাতা এসেছে, তোমার মুখ থেকে সেই কথা শুনতে।

নিমেষে পাথর হয়ে গেলেন শিবতোষ। এ যে উন্মাদ মাধো-লালের গলা কিন্তু কোথায়—কোথায় লুকিয়ে রয়েছে সে অদৃশ্য মেঘনাদের মত? এ কী বিষম চক্রান্তের জাল!

দৈববাণীর মত মাধোলালের গলা আবার শোনা গেল: বল ডক্টর, কে খুন করেছে সুজাতাকে, তার নাম বল তুমি।

তুমি—তুমিই খুন করেছ মাধোলাল।

শিবতোষের গলা কেঁপে গেল।

মিথ্যে বলে লাভ নেই, সত্যি বল। নইলে আজ তোমায় ছাড়বে না সুজাতা।

থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলেন শিবতোষ। হঠাৎ যেন ভয়ানক শীত করছে তাঁর। হল্‌দে রঙের পুলওভার, গরম কোট আর মাফলারেও সেই শীত যেন বাগ মানছে না।

আবার শোনা গেল সেই বিশ্রী অস্বস্তিকর গলার আওয়াজ। আওয়াজটা যেন ঘরের এ-কোণ থেকে ও কোণ ও কোণ থেকে সে-কোণ ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে ঃ বল ডক্টর, বলতে তোমাকে আজ হবেই! ওই দেখ—চেয়ে দেখ—মরা ঠোঁট নেড়ে সুজাতা নিঃশব্দে বলছে ঃ বল, বল, বল—

শিবতোষের মুখখানা যন্ত্রের মতই ঘুরে গেল জানলার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাগানের দিক থেকে হু-হু করে এল একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। উড়ল সুজাতার চুল আর আঁচল, নড়ে উঠলো ঝোলানো আড়ষ্ট হাতখানা। শিবতোষের মনে হল, অল্প ফাঁক-হওয়া গাঢ় নীল ঠোঁট দুটোও যেন নড়ছে মৃদু মৃদু!—যেন কান পাতলে শোনা যাবে কিছু।

হঠাৎ তাড়া-খাওয়া পশুর মত শিবতোষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন দর-জার ওপরে। কিন্তু একি! বন্ধ! দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সেই বন্ধ দরজার ওপর হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে ভয়ার্ত ভাঙা গলায় শিবতোষ চিৎকার করে উঠলেন ঃ দরজা খুলুন প্রতুলবাবু, দরজা খুলুন বলছি!

সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে ঘরের চার কোণ থেকে এক উন্মাদের অট্টহাসি ফেটে পড়ল, হা-হা-হা-হা! ভয় পাচ্ছ ডক্টর? সুজাতাকে ভয়? যাকে এত ভালবাসতে—মরে গিয়ে মুখখানা না হয় একটু বেঁকেই গেছে—ঠোঁট দুটো না হয় কালিলেপা, তবু তো তোমার সেই সুন্দরী বউ, আর মরেছে তোমারই বিয়ের তিথিতে। হা-হা-হা-হা-হা।……

আর শীত নয়, অসহ্য গরম বোধ হচ্ছে শিবতোষের। সারা মুখে আর কপালে বিন্‌বিন্‌ করে ফুটে উঠেছে ঘাম। ঘামে ভিজে গেছে সোয়েটার আর মাফলার। শিবতোষের গলা দিয়ে আর একবার বিশ্রী বিকৃত আওয়াজ বেরোলঃ দরজা খুলুন, দরজা খুলুন দয়া করে!

সেই অশরীরী বীভৎস হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল। এক সেকেণ্ডের স্তব্ধতা। তারপর আবার সেই বিশ্রী অস্বস্তিকর আওয়াজঃ দেরী করো না ডক্টর, বল, কে খুন করেছে সুজাতাকে? নিজের মুখে উচ্চারণ করো তার নাম। নইলে এ জীবনে তোমার সঙ্গ ছাড়বে না সুজাতা। উঠে গিয়ে এখনই দাঁড়াবে তোমার পেছনে, আর ঘুরবে তোমার পিছু পিছু, আর কেবলই বলবেঃ বল, বল, বল!···

শিবতোষের কানের পাশে কনকনে একটা স্পর্শ এসে লাগল।

ও কি জানলা দিয়ে আসা শীতের বাতাস, না সুজাতার হিম-নিঃশ্বাস? সত্যিই কি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে সে মাতালের মত টলতে টলতে? কপালের দু'পাশ বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে ঘাম ঝরছে শিবতোষের। শরীরে স্নায়ুগুলো টান্‌টান্‌ হয়ে গেছে, এখনই যেন ছিঁড়ে পড়বে। ক্লান্ত পশুর মত হাঁফাচ্ছেন শিবতোষ। আতঙ্ক-বিহ্বল চোখের মণি দুটো পুরু লেন্স ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন। চিৎকার করতে গেলেন শিবতোষ, আওয়াজ বেরোল না। সেই বিশ্রী গলা একটানা বলে চলেছেঃ বলে ফেলো—কেন সইছো এই মরণান্তিক যন্ত্রণা? না বললে তোমার রেহাই নেই—রেহাই দেবে না সুজাতা। বল ডক্টর, বল—

সব ধোঁয়া হয়ে আসছে শিবতোষের চোখের সামনে। দু' ফুসফুস ভরে দম নিয়ে বিকারগ্রস্ত রুগীর মত প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন শিবতোষঃ আমি—আমিই খুন করেছি—সুজাতাকে

আমিই খুন করেছি!···আমি, আমি, আমি! ভগবানের দোহাই—দর—জা—

অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতুল আর ডি. সি. একটা ভারি জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

*   *   *   *

ভোররাত্রের দিকে জ্ঞান হল শিবতোষের। গায়ে তখন প্রবল জ্বর। বিকারের ঘোরে ভুল বকছেন। পুলিসের হেফাজতে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুজাতার লাশ তার আগেই ফিরে গেছে মর্গে।

আসামী শিবতোষকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী যখন প্রতুলের বাড়ির ফটক পেরিয়ে গেল, সেই দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ স্বরে ডি,সি. বললেন, অত বড় বৈজ্ঞানিকের কি শোচনীয় পরিণাম!

তামাকের শূন্য পাইপটা হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে প্রতুল বললে, মানুষ আসলে সেই বনমানুষই রয়ে গেছে মিস্টার রায়-চৌধুরী। এই ধরণের মারাত্মক ক্রাইমগুলো সেই বনমানুষের হাতেরই খেলা। শিক্ষাই বলুন আর সভ্যতাই, বলুন, মানুষের ভেতরকার পশুটাকে চাপা দিয়ে রেখেছে মাত্র—মেরে ফেলতে পারে নি, কোন দিন পারবে কিনা জানি না। নইলে কে ভাবতে পেরেছিল যে ডক্টর শিবতোষ সান্যালের মত পণ্ডিত লোক বুড়ো বয়েসে সুজাতার প্রেমে পড়বেন, আর তরুণ মাধোলালেব প্রতি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে নিজের স্ত্রীকে খুন করবেন!

ডি. সি. বললেন : আচ্ছা, মাধোলাল যে খুনী নয়—এটা আন্দাজ করলেন কিসের থেকে?

সেও একখানা চিঠি থেকে। ঘটনার পরদিন মাধোলালের হোস্টেলে যখন গেলাম, সে তখন এই চিঠিখানা লিখছিল।

পকেট থেকে ভাঁজ-করা একখান কাগজ খুলে প্রতুল পড়ল

সুজাতা,

ইস্ট আফ্রিকার চাকরিটা নেওয়াই সাব্যস্ত করলাম। এই বিচ্ছেদ তোমার-আমার দুজনের পক্ষেই ভালো। নইলে অশান্তি যাবে না। গতকাল তুমি যখন আমার কোটের বাটন্-হোলে একটা রক্ত-গোলাপ পরিয়ে দিচ্ছিলে, তখন ডক্টর সান্যাল দেখে ফেলেছিলেন বোধ হয়। তাই, বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে তিনি—

কাগজখানা মুড়ে পকেটে রেখে প্রতুল তামাকের পাউচ বের করলে। তারপর বলল, শেষ চিঠিখানা আর শেষ হয় নি। হলেও সুজাতার কাছে পৌঁছতো না। যাই হোক, চিঠিখানা পড়ে নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, মাধোলাল খুন করে নি। করলে, সে পরদিন সুজাতাকেই চিঠি লিখতে বসত না নিশ্চয়।

ডি. সি বললেন, মানল্াম। কিন্তু শিবতোষই যে খুনী, কোন্ সূত্র থেকে সন্দেহ করলেন?

আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম যে, সুজাতা-হত্যার রহস্য জানে শুধু শিবতোষ নিজে আর তাঁর বাড়ির সেই নখদন্তওয়ালা ভাল্লুক প্রহরী। ঘটনার রাতে সেই ভাল্লুক প্রহরীই চুপিচুপি আমাকে হত্যা-রহস্যের সূত্র জুগিয়েছিল।

বটে?

হ্যাঁ। ঘটনার রাতে আমি যখন শিবতোষের বাড়ি যাই, টর্চ জ্বালাতেই সিঁড়ির গোড়ায় সেই ভাল্লুক প্রহরীর হাতের নখে একটি জিনিস আটকে আছে দেখলাম।

পকেট থেকে প্রতুল জিনিসটা বের করলে। এক টুকরো সোনালি হলদে রঙের পশম।

ডি. সি.-র দু' চোখে কৌতূহল আর বিস্ময় ফুটে উঠল। বললেন, এই রঙেরই সোয়েটার শিবতোষের গায়ে দেখেছি না?

প্রতুল মৃদু ঘাড় নাড়লে। ডি. সি. বললেন, কিন্তু শিবতোষের সোয়েটারের পশম ভাল্লুকের নখে এল কি করে?

প্রতুল বললে, সুজাতাকে খুন করে আলো নিভিয়ে শিবতোষ যখন চোরের মত লেবরেটরীতে পালাচ্ছিলেন, তখন অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে গিয়ে ভাল্লুক প্রহরীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তাই বিশ্বস্ত প্রহরীর হাতে আততায়ীর নিশানা থেকে গিয়েছিল। এই থেকেই আমার সন্দেহ। সন্দেহ আরো বাড়ল যখন ঘটনার রাতে শিবতোষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দেখুন ত' সুজাতা দেবীর গা থেকে কোনো গয়না খোয়া গেছে কি না?' তিনি না দেখেই বলে উঠলেন, না! অথচ খুনের কথা তিনি নাকি জানতেন না! বুঝতে পারলাম শিবতোষ সত্য গোপন করছেন। তারই ফলে টেলিফোনে মাধোলাল সেজে শিবতোষকে কবুল করানর চেষ্টা এবং অবশেষে স্পেশাল পার্মিশন নিয়ে সুজাতার লাশ বাড়িতে এনে, ঘরে গুপ্ত মাইক্রোফোন বসিয়ে, শিবতোষের জন্য জাল পাতলাম।

প্রশংসাভরা গলায় ডি. সি. বললেন, পন্থাটা প্রতুল লাহিড়ীরই উপযুক্ত।

পাইপটা ধরিয়ে প্রতুল ব্যস্ত হয়ে বললে, আমি একবার ডক্টর সান্যালের লেবরেটরীতে যাচ্ছি। যাবেন নাকি?

সেখানে আবার কেন?—ডি. সি. প্রশ্ন করলেন।

গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে প্রতুল জবাব দিলে, খাঁচার বাঁদরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসব। তারা বনে চলে যাক। নইলে হয়তো কোন্‌দিন শুনব কোনো ব্যর্থপ্রেমিক বাঁদর তার বাঁদ্‌রীকে খুন করে বসেছে!

—

চেরীফুল

অনেকদিনের পুরোনো ফোটোগ্রাফখানা দেখতে দেখতে আমার থিয়োজফিষ্ট বন্ধুটি বলছিলেন, মানুষ যদি কোন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মরে, তাহলে তাব বিদেহী আত্মা এই মরজগতের স্তর ছাড়িয়ে উর্ধ্বলোকে যেতে পারে না। অপূর্ণ বাসনার তীব্র আকর্ষণ অথবা কোন প্রিয়জনের প্রতি গভীর আসক্তি তাকে মুক্তি দেয় না। মুক্তি সে চায়ও না। মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মা ঈপ্সিত বস্তু বা বাঞ্ছিতজনের চারপাশে কেবলই ঘুরে বেড়ায়। বিদেহী হলেও সেই সব প্রেতাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এমন কি ক্যামেরার চোখে—ফোটোগ্রাফের কাগজেও তাদেব অস্পষ্ট অস্তিত্ব ধরা পড়ে, প্রেত-তত্ত্বের ইতিহাসে এমন নজিরও বহু আছে। তোমার ফোটোগ্রাফের সঙ্গে এই যে মৃত মেয়েটির অস্পষ্ট ছবি উঠেছে, এ ছাড়া এ ব্যাপারের আর কোন ব্যাখা খুঁজে পাচ্ছি না!

হয়তো বন্ধুর কথাই সত্যি।

বহুদিনের স্মৃতির মরচে-পড়া দরজা হঠাৎ খুলে গেল···

উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। যুদ্ধের কড়া মদে কলকাতা শহর তখন টলমল। ব্ল্যাক আউটের রাত, তবু স্ফূর্তির রং মশাল ঝরে' ঝরে' পড়ছে শহরের হোটেলে, কাফেতে, সিনেমায় আর গণিকা-পল্লীতে। অতিরিক্ত পয়সার মত অতিরিক্ত জীবন কি করে খরচ করবে, মানুষ যেন ভেবে পাচ্ছে না।

শহরের আরও কয়েকটা জায়গায় বেহিসেবী ফুর্তী চলেছে। সেগুলো রঙমশাল নয়, তুবড়ি বাজী। হুস্ করে খানিক জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে। হাজার হাজার টাকার তুবড়ি বাজী। সে জায়গাগুলো হ'ল জুয়ার আড্ডা।

এমনই এক আড্ডার সন্ধানে আমি চলেছি। ব্ল্যাক আউটের রাত, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কুয়াসা-মাখা অন্ধকারে রাস্তার ঠোঙা-পরা বাতিকগুলোর চোখে যেন গেয়োন্দার চোরা চাউনি। ওভার-কোটের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি বৌবাজের পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে পশ্চিমমুখো। খানিকটা এগোলেই ডান দিকে শিবমন্দির। তারই গা দিয়ে ছাতাওলা গলি। চায়না টাউন।

আমার গন্তব্য সেইখানে। আ চঙের আড্ডা। কলকাতার বনেদী জুয়ারী যারা, আ চঙের আড্ডা তাদের চেনাতে হয় না। নানকিং হোটেলের থেকে কিছু তফাতেই, প্যাঁচাল সরু গলির একটা বাঁকে চোলাই করা চীনে মদ সামসু আর তাসের জুয়ার জন্যে আ চঙ বিখ্যাত। কিন্তু হরি হরি! গিয়ে দেখি আ চঙের আড্ডা অন্ধ-কার। খবর পাওয়া গেল সন্ধ্যেবেলা পুলিস এসে হানা দিয়ে গেছে।

পকেটের টাকাগুলো বাঁচল বটে, তবু খুশি হতে পারলাম না। গত রাতে অনেকগুলো টাকা লোকসান গেছে। ভেবেছিলাম আজ উসুল করব। অবশ্য সব জুয়াড়ীই তাই ভাবে। আর ভাবে বলেই খেলে।

হাতঘড়িতে দেখলাম ইংরেজি মতে পরদিন। অর্থাৎ রাত সাড়ে বারোটা। আ চঙের আড্ডায় এলে রাতের পান এবং আহার দুটোই ওখানে চলে। কিন্তু এখন যাই কোথায়? নান্‌কিং-এর অবস্থা যা দেখে এলাম, তাতে অপেক্ষা করলে ভোর নাগাদ খাবার পাওয়া যেতে পারে, যদি কিছু বাকি থাকে। আ চঙের অন্ধকার

আস্তানার সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উল্টো পথে পা চালিয়ে দিলাম।

কপাল ভাল! শ'খানেক গজ এগোতেই দেখি ছোট্ট একটি চীনে হোটেল তখনও খোলা। এ রকম গরীব হোটেল এ পাড়ায় অবশ্য আরও কয়েকটি আছে, তবে রাত বারোটার পর সেগুলো বড়-একটা খোলা থাকে না, মিলিটারীদের উৎপাতের ভয়ে। দু'পাত্র পেটে পড়লেই 'আউট অব বাউণ্ডস্' নোটিশটা প্রায়ই তাদের নজরে পড়ে না।

হোটেলটা আমার একেবারে অপরিচিত নয়। ঢুকতেই প্রৌঢ় মালিক লী সন সোনা-বাঁধানো দাঁতটি দেখিয়ে অভ্যর্থনা করলে, কম, কম, জেন্টিলম্যান।

নিচু একতলা ঘরখানা একটা বড় শোবার ঘরের চেয়ে বড় হবে না। তারই একদিকে গোটাকতক কাঠের টেবিল আর চেয়ার, ওদিকটার ছিটের পর্দার আড়ালে কিচেন।

একটু অবাক হলাম। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় খদ্দের নেই, অথচ এত রাত অবধি লী সনের হোটেল খোলা কেন?

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে লী সন জিজ্ঞেস করলে, কি দেবো? প্রন না চিকেন? খুব ভাল সস্ আছে আজকে?

বললাম, যা তোমার খুশি! দেরী হয় না যেন!

গরীব হলেও চীনে হোটেল কখনও তৈরি খাবার রাখে না। খদ্দের অর্ডার করলে তৈরি করে দেয়। তাই গোলাপ ফুল আঁকা ছিটের পর্দাটার পানে চেয়ে লী সন হাঁকলে, ওলান্, চিকেন অ্যাণ্ড ফ্রায়েড রাইস—কুইক!

ওভারকোটের পকেট থেকে স্কচের ফ্লাস্ক বের করে বললাম, সোডা, লী সন!

সোডা আর গ্লাশ নিয়ে এসে লী সন আমার সামনের চেয়ারে বসল। সোনা-বাঁধানো দাঁতটি আবার দেখিয়ে বললে, ড্রিঙ্ক তো আমার এখানেও মেলে। সেরা চাইনিজ মাল। এ জিনিস আ চঙের আড্ডাতেও পাবে না।

বললাম, তাই নাকি? ভবিষ্যতে দেখা যাবে!

লী সন উৎসুক হয়ে বললে, একটু চেখে দেখবে নাকি?

গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে আমি বললাম, তার আগে আমারটা চেখে দেখ।

খুশিতে লী সনের তিনটে সোনা-বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললে, থ্যাঙ্কিউ জেন্টিলম্যান! ঠাণ্ডাটাও আজ পড়েছে বেজায়।

লী সনের ভদ্রতাবোধ আছে বলতে হবে। গ্লাসটা মুখে তোলবার আগে আর একটা গ্লাস সে এনে হাজির করল।

গ্লাসে গ্লাসে টুং করে একটা শব্দ হ'ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, তোমার হোটেলআজ এত রাত অবধি খোলা কেন লী সন?

পকেট থেকে এক টুকরো তামাক বের করে লী সন মুখের মধ্যে কসে গুঁজে রাখলে, তারপর কনুই দুটো টেবিলে ঠেকিয়ে বললে, আজকাল পয়সার বড় দরকার। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্র সব আক্রা হয়ে গেছে কিনা! অনেষ্ট পিপ্‌ল্‌দের দিন চলা মুস্কিল। এই হোটেল ছাড়া আমার তো রুজি-রোজগার নেই। কাজেই আজকাল আর সকাল সকাল বন্ধ করি না।

বললাম: আর, চীনে মদ বিক্রি? সেটাও তো তোমার ব্যবসা?

লী সন উঠে গিয়ে পিচ করে থুথু ফেলে এল। বললে, ওটা শুধু তোমাদের প্লীজ করার জন্যে। নইলে—বিশ্বাস করো, ওতে আমার একটা পাইও লাভ থাকে না।

হাসি চেপে বললাম, লী সন, তুমি ধর্মাত্মা লোক। আজকের এই কালো বাজারে তুমিই একমাত্র সাদা।

লী সন খুব শান্ত স্বরে বললে, জোক করো না জেন্টিলম্যান। আমার মত যারা গরীব, তাদের মন সত্যিই সাদা।

পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললাম, তা হবে। কিন্তু তোমার চিকেনগুলো এতক্ষণে ফাউল হয়ে গেল যে! তোমার হোটেলের সার্ভিস বড় লেট লী সন।

'আমি দেখছি' বলে লী সন উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা সরু কোমল আওয়াজ কানে এল ঃ লী সন! খাবার তৈরী।

আওয়াজটা লক্ষ্য করে তাকাতেই চোখের আমার পলক পড়ল না। গোলাপ ফুল আঁকা ছিটের পর্দার ফাঁকে মস্ত বড় একটা জ্যান্ত গোলাপ।

লী সন বললে, খাবারটা তুমিই দিয়ে যাও ওলান।

দু'হাতে দুটো ধূমায়িত ডিশ ধরে ওলান এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। চীনে মেয়ে যে এত সুন্দরী হয়, আগে জানা ছিল না। চীনেদের বয়েস বোঝা না গেলেও তরুণী মেয়ের বয়েস লুকোনো থাকে না। সাদা অ্যাপ্রনের নীচে গোলাপী রঙের ফ্রক তার গায়ের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। ছোট চোখে ঘন কালো দীর্ঘ পল্লবের ছায়া পড়েছে গোলাপি গালে।

বললাম, এর আগে তোমার স্ত্রীকেই রান্না করতে দেখেছি না লী সন?

লী সন বললে, বুড়ি স্বর্গে রাঁধতে গেছে। তাই হোটেলের রান্না আজকাল ওলানই করে।

তোমার মেয়ে বুঝি?

লী সন বললে, এক রকম তাই! ওলান আমার স্ত্রীর বোন্‌ঝি। ওকে সিঙ্গাপুর থেকে আনিয়েছি।

তারপর ওলানের দিকে চেয়ে বললে, জেন্তিলম্যান খুব ভাল লোক। আমার সেরা খদ্দের।

ফ্রকের প্রান্ত দুটো দু'হাতে ধরে বিদেশী কায়দায় ওলান অভিবাদন জানালে। বোধ করি আমার কটা চামড়া আর বিলিতি স্যুটের খাতিরে।

লী সন এবার ব্যস্ত হয়ে বললে, জেন্তিলম্যান আমাদের সেরা খদ্দের যখন, তখন ওকে খাতির করা উচিত!—নয় কি ওলান? তুমি আমাদের ঘরের তৈরী কিছু মদ নিয়ে এস চট্‌ করে।

ওলান চলে গেল ফুরফুরে একটি প্রজাপতির মত।

ওলানের ফিরে আসতে দশ মিনিটও লাগল না। সে এসে ছোট ছোট দুটি গ্লাস টেবিলের ওপর রাখল। ফিকে বাদামী রঙের পানীয় টল্‌টল্‌ করছে। লী সনকে বললাম, তোমাদের এই সামসু খেতে আমি অভ্যস্ত নই। তবু যে-হাত এই মদ পরিবেশন করেছে, সে হাতকে আজ সম্মান দেব।

ছোট গ্লাসটা তুলে ধরলাম। তাকিয়ে দেখি ওলানের মুখে যেন সিঁদুর লেগেছে। অপর গ্লাসটা গলায় ঢেলে দিয়ে লী সন তৃপ্তিতে সুদীর্ঘ একটা আওয়াজ করলে, আ! যতই স্কচ খাও, চাইনীজ ড্রিঙ্কের তুলনা হয় না জেন্তিলম্যান।

আমার গলা দিয়ে তখন খানিকটা তরল আগুন জ্বলতে জ্বলতে পেট অবধি নামছে। সিগারেট কেস থেকে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট মুখে গুঁজে বললাম, সত্যিই এর তুলনা হয় না লী সন।

সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে লী সন বললে, একটু পেটে পড়লেই প্রাণে কেমন আনন্দ হয় দেখেছ?

মুখে বললাম, আনন্দ বলে আনন্দ! মনে মনে বললাম, এত আনন্দ সহ্য করতে পারলে হয়।

লী সন বললে, আর একটু নিয়ে এস ওলান, জেন্তিলম্যানের ভাল লেগেছে।

মানা করতে যাচ্ছিলাম, লী সন ব ধা দিয়ে বলে উঠল ঃ না, না, এর জন্যে কোন দাম তোমাকে দিতে হবে না জেন্তিলম্যান। এ আমার বন্ধুত্বের উপহার। ওলান, যাও চট্ করে নিয়ে এস।

একটু দ্বিধা করে ওলান বললে, কিন্তু জেন্তিলম্যান বলছেন উনি অভ্যস্ত নন।

লী সন প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, আঃ, যা বলছি তাই শোন।

ওলান আবার চলে গেল। লী সন একবার সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা নূতন তামাক মুখে গুঁজে দিলে। তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে, কেমন লাগছে ওলানকে ?

বেশ ভাল মেয়ে।

ভাল রান্না ছাড়াও ওলান খুব ভাল নাচতে পারে। সিঙ্গাপুরে ও গায়েশা ছিল কিনা। ধর, কোন রাতে যদি তোমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে না হয় ওলান তোমাকে নাচ দেখাবে। যত্ন করে ঘুম পাড়াবে।

বললাম, ধন্যবাদ লী সন। বাড়ি ফেরার অনিচ্ছা আপাতত আমার নেই। বাড়ি ফেরা দরকার।

তার জন্যে তাড়াতাড়ি কেন ? আমি ট্যাক্সি এনে দেব। ট্যাক্সি না পাই, ফিটন।

ওলান ফিরে এল এবার শুধু একটা গ্লাস নিয়ে। একটা মেয়ের সামনে বীরত্ব দেখাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আবার খানিকটা ফিকে বাদামী রঙের তরল আগুন জ্বলতে জ্বলতে আমার পেটে নেমে গেল।

লী সন বললে, ওলান সত্যিই ভাল মেয়ে। তাই নয় কি জেন্টিলম্যান ?

আমি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। তারপর গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠলাম ঃ ওলান চীন দেশের রাণী, মিশরের ক্লিওপেট্রা, বাগদাদের রাজকুমারী !

ওলান হেসে ফেলল। দোপাটি ফুলের তুটি পাপড়ির মাঝখানে একসারি মুক্তো দেখা গেল। হেসে বললে, আপনি বসুন জেন্টিল-ম্যান—নইলে পড়ে যেতে পারেন।

ধপ করে আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। কি যেন বলতে গেলাম, বলতে পারলাম না। স্কটল্যাণ্ড আর চীন দেশ—তুয়ে মিলে আমার মাথার মধ্যে তখন ভেল্কি শুরু করে দিয়েছে। মাথার ওপর ইলেকট্রিকের সাদা আলো কেমন অদ্ভুত হলদে রঙের হয়ে গেল। আর সেই আশ্চর্য হলদে আলোর মাঝে সারা ঘরময় নীল রঙের তারাবাজি ফুটতে লাগল। দেখতে দেখতে লী সনের মুখটা একটা ড্রাগনের মুখ হয়ে গেল···ড্রাগনের তিনটে দাঁত সোনা-বাঁধানো··· ওলানের জায়গায় হালকা গোলাপি রঙের একটা প্রজাপতি পাখা নাড়ছে······

তারপর আর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। ঘুমের ঘোরে মনে হচ্ছিল কপালে আর সারা মুখময় একটা প্রজাপতি তার ফুরফুরে ডানা তুটো বুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তারই সুখাবেশে চেতনা আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মুখের ওপর চলতে চলতে প্রজাপতির পাখা তুটো হঠাৎ থেমে গেল। তু'হাত দিয়ে আলতো ভাবে ধরলাম। তারপর চোখ মেলে দেখি

প্রজাপতি নয়, সরু সরু নরম অঙুল। সে-আঙুল থেকে আমার চোখ দুটো উঠে এল একটি মুখের ওপর। মোমের মত সাদা গালে কালো পল্লবের দীর্ঘ ছায়া। ছোট ছোট চোখের ঘন কালো তারায় উদ্বেগ আর মমতা।

ঘুমের ঘোর বোধ হয় কাটে নি। তবু বলে উঠলাম, ওলান, তুমি!

দোপাটির দুটি পাপড়ি অল্প বিভক্ত হয়ে একসারি মুক্তো দেখা দিল।

আবার বললাম, তুমি এখানে কেন ওলান? আমার ঘরে কেমন করে এলে?

ভাঙা ভাঙা ইংবেজিতে ওলান বললে, এটা আমারই ঘর জেন্টিলম্যান।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সত্যিই অচেনা ঘর। অপরিচিত শয্যা। ওলান বললে, কাল রাতে তুমি একেবারে 'আউট' হয়ে গিয়েছিলে। তাই লী সন তোমাকে এনে এখানে রেখে গিয়েছে।

তাই বটে। পায়ের জুতো জোড়াটা ছাড়া গায়ের ওভারকোটটা পর্যন্ত খোলা হয় নি। মনে পড়ে গেল গতরাত্রে লী সনের কথাঃ 'ধর কোন রাতে যদি তোমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে না হয়, ওলান তোমাকে নাচ দেখাবে, যত্ন ক'রে ঘুম পাড়াবে।' তবু লী সনের আতিথেয়তা আর সুন্দরী ওলানের পরিচর্যায় মনটা প্রসন্ন হতে পারল না। কেননা আমি তাস নিয়ে জুয়া খেলি। নারীদেহ নিয়ে জুয়া খেলতে অভ্যস্ত নই, পছন্দও করি না।

ওলান একখানা চিরুনী এনে বললে, তোমার চুলগুলো গুছিয়ে দেবো জেন্টিলম্যান?

চিরুনীখানা তার হাত থেকে নিয়ে বললামঃ না, থাক, আমি নিজেই পারব—রাত এখন কত?

মৃদু হেসে ওলান বললে : রাত আর নেই, ভোর হয়ে গেছে।

ব'লে বাতির সুইচটা তুলে দিল সে। খোলা একটা জানলা দিয়ে শীতের ভোরের কুয়াসা-মাখা খানিকটা নোংরা আলো এসে ঘরের অন্ধকারকে ঘোলাটে করে তুললে।

বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বললাম, যাই।

ওলান বললে, এখনই ? চা আনব ? কিংবা আমার ঘরে অরেঞ্জ আছে, তার রস খেলে মাথাধরা ছাড়ে।

ধন্যবাদ ওলান। দরকার হবে না। আমার দেরি হয়ে গেছে।

অভ্যাসের বসে বাঁ-হাতের মণিবন্ধটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই অবাক হয়ে গেলাম। আমার সোনার রিষ্টওয়াচটা অদৃশ্য হয়েছে। বললাম, আমার ঘড়ি ?

ওলান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কাল রাতে লী সন যখন তোমাকে এনে শুইয়ে দিল, তোমার হাতে ঘড়ি তো ছিল না জেন্তিলম্যান !

বলে কি ! ঘড়ি ছাড়া আমি এক-পাও চলি না। তবে কি নেশার ঘোরে হাত থেকে খুলে পড়েছে কোথাও ? কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও একটু বাকি ছিল আমার।

ওলানকে বললাম, কাল খাবারের দামটা দেওয়া হয় নি। সেটা নিয়ে রাখো, লী সনকে দিও।

ব'লে ওভারকোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢোকাতেই হাতটা আমার আটকে গেল যেন। ম্যানিব্যাগ উধাও।

আমার মুখ-চোখের চেহারা নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছিল। ওলান আশ্চর্য হয়ে বললে, কি হ'ল জেন্তিলম্যান ?

'কিছু না' বলে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, দামটা বাকি রইল। আবার একদিন এসে দিয়ে যাব।

ওলান একটু হেসে বললে, বেশ, তাই দিও। কিন্তু কাল সারারাত মাথার যন্ত্রণায়'তুমি ছটফট করেছ। অত মদ আর খেয়ো না জেন্তিলম্যান।

একটা তেতো হাসিতে ঠোঁট দুটো আমার কুঁচকে গেল। 'এ যে দেখছি চীনে চন্দ্রমুখী! তাই দেবদাসের ভাষায় না বলে পারলাম না, না খেলে তোমাদের চলবে কি করে?

কথার শ্লেষটুকু চীনে মেয়ে বোধ করি ধরতে পারল না। বললে, তার মানে?

বললাম, আমরা মাতাল না হলে তোমাদের ঘরে সোনার রিষ্টওয়াচ আর মনিব্যাগ জমা হবে কি ক'রে?

ওলানের মুখটা টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেই মোমের মত সাদা হয়ে গেল। ছোট ছোট ঘন কালো চোখ দুটো টর্চের ছোট দুটো বাল্‌বের মত 'এক লহমার জন্যে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে উঠল: তার মানে আমি চোর! আমায় তুমি চোর বলছ জেন্তিলম্যান!

রাগে আর বিতৃষ্ণায় সারা শরীর আমার জ্বলছিল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম: না, বলছি যে গায়েশা মেয়েরা পরম সাধু। দয়া করে এখন যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে কি?

ওলান আর একটি কথাও বললে না। মুখ নিচু করে এগোল। অতি পুরানো কাঠের একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম তার পিছু পিছু। তারপর সদর দরজা।

শীতের আলো এখন অনেকটা ফুটেছে। তবু ছাতাওয়ালা গলির ঘুম ভাঙে নি এখনও। গলিতে পা দিয়ে একবার নিজের অজান্তেই

পিছন ফিরে তাকালাম। দরজার কপাটের পাশে ওলান তেমনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে।

আ চঙের আড্ডায় বেশ কিছুদিন যাওয়া হয় নি। ক্যাশের অভাব ঘটেছিল। তাছাড়া ছাতাওয়ালা গলিতে পা দেওয়ার ইচ্ছেও তেমন ছিল না। কিন্তু জুয়াড়ীর মন কম্পাসের কাঁটার মত জুয়ার আড্ডার দিকেই ঘুরে আছে।

যেতেই হল একদিন। তারিখটা পঁচিশে ডিসেম্বর। বড়দিনের রাত। ফিরিঙ্গি-কলকাতা আমোদের হুল্লোড়ে শ্যাম্পেনের খোলা বোতলের মতই উপচে পড়ছে। শীতটাও আজ পড়েছে কড়া। ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে বৌবাজার পোস্ট অফিস পার হয়ে গুটি গুটি ডাইনে বেঁকলাম। চিরপরিচিত ছাতাওয়ালা গলি ! রাত এগারোটা বেজে গেছে। যাক। জানি আজ আ চঙের আড্ডা সারা রাত খোলা।

কিছুটা এগোতেই সস্তা জ্যাজ নাচের সুর ভেসে এল। আরও কয়েক পা এগোতেই দেখি লী সনের হোটেল আজ জমজমাট। চীনে ফানুস আর বেলুনের ছড়াছড়ি। দবজার সামনে সোনালি রঙের পর্দা ঝুলছে। ভেতরে জ্যাজ নাচের মিউজিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে মত্ত পুরুষ কণ্ঠের অশ্লীল ইংরেজি গান শোনা যাচ্ছে। রাস্তা থেকে তিনটে ধাপ উঠতে লী সনের হোটেলের দরজা। তৃতীয় ধাপে উঠে সোনালি পর্দা একটুখানি সরিয়ে দেখলাম, লী সনের হোটেলের আজ ভোল ফিরে গেছে। কাঠের টেবিলগুলো ধবধবে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। ফুলসমেত একটা করে ফুলদানি বসানো। জন চারেক টেরিটি বাজার মার্কা ফিরিঙ্গি বাজনদার অর্কেস্ট্রা জুড়েছে। কোত্থেকে এসে জুটেছে

চীনে আর ফিরিঙ্গি মেশানো একটা দল। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ-বা টেবিলে চড়ে কোরাসে বড়দিন পালন করছে। আর—

ঘরটার ঠিক মাঝখানে দুধের ফেনার মত সাদা ধবধবে একটা ফুরফুরে প্রজাপতি মিউজিকের তালে তালে নেচে বেড়াচ্ছে। সত্যিই ফুরফুরে প্রজাপতি নয়, গায়েশা মেয়ে ওলান। নাচের ঢেউয়ে ধবধবে ফ্রকে-ঢাকা তার শরীর দুলে দুলে উঠছে। আর নানা রঙের চীনে ফানুসের আলোর ছটায় তার যৌবনের লাস্য উছলে উঠছে সাদা কাচের পাত্রে রঙীন 'কক্‌টেলের' মত।

ওলানের এ রূপ আগের দিন দেখি নি, ওলান আজ ভীরু স্বল্প-ভাষিনী নয়। আজ তার মুখ কথা কইছে, চোখ কথা কইছে, শরীর যেন কথা কইছে।

পর্দা সরিয়ে কখন ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম, ওলান খেয়াল করে নি। কিন্তু খেয়াল করেছিল লী সন। সোনা-বাঁধানো দাঁতটি দেখিয়ে সে প্রায় ছুটে এসে একটা লাল বেলুন দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালে, হ্যাপি ক্রীসমাস জেন্টিলম্যান। এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

টেবিলের একটা কোণ বেছে নিয়ে বললাম, তোমার এ ক্রীসমাস সত্যিই হ্যাপি দেখছি লী সন।

খুশীতে লী সনের তিনটে সোনা-বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বললে, ড্রিঙ্ক ?

বললাম, নো চাইনিজ প্লীজ।

অপ্রস্তুত হয়ে লী সন বললে, না, না, আজকে স্কচ আনিয়েছি। তারপর বাঁ-চোখটা ঈষৎ ছোট করে বললে, সেদিন রাত্রে বেশ আরামে ছিলে তো ?

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, সে আর বলতে !

খুশি হয়ে লী সন ড্রিঙ্ক আনতে চলে গেল। আর এক মিনিট পরেই দেখি ওলান আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্থ নাচের পর ঘন নিঃশ্বাসে বুকটা তার ওঠা-নামা করছে। আবছা গলায় সে বললে, মনে মনে তোমাকেই চাইছিলাম জেন্টিলম্যান। আমার বড় বিপদ। প্লীজ, আমাকে বাঁচাও!

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, বিপদ! কি বিপদ?

তেমনি আবছা গলায় ব্যাকুল ভাবে ওলান বললে, পরে বলব। এখন শুধু জেনে রাখো, আজ রাতেও তোমাকে আমার ঘরে থাকতে হবে। প্লীজ জেন্টিলম্যান!

সেই তেতো হাসিটা ঠোঁটের কোণে আবার ফুটে উঠল। বললাম, কিন্তু আজ তো আমার হাতে ঘড়ি নেই, টাকাও অল্প।

ত্রস্ত কণ্ঠে ওলান বলে উঠল, ওসব কথা পরে হবে। সব জানাব তোমায়। শুধু আজকের রাতটা তুমি আমাকে দাও।

কি একটা বলতে গেলাম, অর্কেস্ট্রার গর্জনে চাপা পড়ে গেল। আর বেতের মত ছিপছিপে শরীরে ঘূর্ণিপাক দিতে দিতে ছুটে চলে গেল ওলান। চেয়ে দেখি লী সন ড্রিঙ্ক নিয়ে আসছে।

ওলানের কথাগুলো অদ্ভুত মনে হল। গায়েশা মেয়ের এ কোন্ নতুন চাল কে জানে!......

একটা দ্রুতছন্দের নাচ নাচছে ওলান। ছোট ছোট লঘু পদ-ক্ষেপে যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে এ-টেবিলের পাশ দিয়ে, ও-টেবিলের কোণ ঘেঁষে, সে-টেবিলের পেছন দিয়ে। ঝড়ে মাতাল বনভূমিতে একটা প্রজাপতি যেন ছিটকে বেড়াচ্ছে।

চীনে আর ফিরিঙ্গিগুলোর অবস্থা দেখবার মত। নেশার ঝোঁকে

প্রজাপতিটাকে তারা ধরবার চেষ্টা করছে হাত বাড়িয়ে। আর দুরন্ত চপল প্রজাপতি হাত এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিবারেই। লক্ষ্য ফস্‌কে যাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে মাতালগুলো। শুরু হয়েছে মস্ত একটা কৌতুকের খেলা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না ওলান ফাঁকি দিতে। সবচেয়ে লম্বা-চওড়া আর সবচেয়ে জোয়ান ফিরিঙ্গিটার উল্কি-আঁকা লম্বা হাতের মধ্যে ধরা পড়ে গেল ওলানের ক্ষীণ কটি। হো হো করে হেসে উঠল দলের অন্য সবাই।

ফাঁদে-পড়া পাখির মত ছটফট করছে ওলান। আর ছোট ছোট চোখের অসহায় দৃষ্টি বারবার এসে পড়ছে আমার মুখের ওপর!

মিউজিকের গর্জন থামতেই শুনতে পেলাম, ওলান হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলছে, ছেড়ে দাও ন্যাট্—ছেড়ে দাও আমাকে—

উত্তরে ন্যাট্ একঝলক হেসে ওলানকে টেনে আনল বুকের কাছে। তারপর ঝুঁকে পড়ল তার থ্যাবড়া-নাক মুখখানা।

ওলানের বিপদটা এবার বোঝা গেল।

টেবিল ছেড়ে কখন উঠে দাঁড়িয়েছি জানি না। তিন পেগ স্কচ তখন কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুঃসাহসী আমি নই, তবু চোখের সামনে এই বন্য দৃশ্যটাকে বরদাস্ত করতে পারলাম না। সোজা এগিয়ে গিয়ে ন্যাটের নুয়ে-পড়া মুখখানা ঠেলে উঁচু করে দিলাম। তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় বললাম, ছেড়ে দাও।

মুহূর্তখানেকের জন্যে হতচকিত হয়ে গেল থ্যাবড়া-নাক ফিরিঙ্গিটা। পরক্ষণেই বাঘের থাবার মত তার বাঁ হাতের প্রকাণ্ড মুঠিটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল আমার থুতনি লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই আমি এক-পা পিছিয়ে গেছি।

একটা কুৎসিত'গালাগাল দিয়ে উঠল ন্যাট্। তারপর ওলানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন আক্রমণের জন্যে তৈরী হল।

তেমনি শান্তগলায় বললাম, আমি সব সময় 'গান' নিয়ে চলা-ফেরা করি। আশা করি, সেটা এখানে ব্যবহার করতে হবে না।

আবার এক মুহূর্তের জন্যে থতিয়ে গেল ন্যাট্ এবং তার দলের সাথীরা। যে মোটা চীনেটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছিল, সে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে বলে উঠল, কাম অন্ ন্যাট্।

কাঁচা মাংসের স্বাদ পেয়েছে ন্যাট্। যেতে সে রাজি নয়। চিৎকার করে বললে : তোমরা যাও, আমি যাব না। ওলান আমার গার্ল।

আমি শুধু বললাম, ওলান আমার গার্ল।

ন্যাট্ যেন ক্ষেপে গেল : কক্ষনো না। ওলান আমার গার্ল। লী সনকে জিজ্ঞেস করো।

লী সন এতক্ষণ একটাও কথা বলবার ফুরসুৎ পায়নি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাছে এসে আমায় বললে, ন্যাট্ ঠিকই বলছে জেন্টিলম্যান। ওলানের জন্যে ন্যাট্ গতকাল একশো টাকা আগাম দিয়ে গেছে।

বললাম, আরে বা! আমি যে সেদিন ওলানের জন্যে দুশো টাকা দিয়ে গেছি, সে-কথা ভুলে গেছো বুঝি লী সন?

ট্রাউজারের পকেট থেকে আমার ডান হাতখানা বেরিয়ে এসে লী সনের একখানা হাত ধরে ঝাকানি দিলে। সেই সঙ্গে একশো টাকার খান দুয়েক নোট চলে গেল লী সনের মুঠোয়।...

সোনা-বাঁধানো তিনটে দাঁত বের করে লী সন অনুতপ্ত গলায় বললে, সরি—ভেরি সরি জেন্টিলম্যান। সত্যিই একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

ন্যাটের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, শুনলে তো?

হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম শান্ত হয়ে ন্যাট্ বললে, শুনলুম। কিন্তু

তার আগে ওলানকে জিজ্ঞেস করো, ওলান কাকে চায়। তোমাকে না আমাকে।

ওলানের জবাবের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইল ঘরের সবাই। ঘরে পিন পড়লে যেন শোনা যায়, কয়েকটা মুহূর্ত এমনি স্তব্ধ। তারপর দুই চোখে উছলে-পড়া ঘৃণা নিয়ে ওলান বলে উঠল ঃ তোমায় আমি ঘৃণা করি ন্যাট্।

ওলান আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। আমার হাত ধরে ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেই পুরোন নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছি, নিচ থেকে তখন শোনা গেল একরাশ কাঁচ ভাঙার আওয়াজ।

আর সেই সঙ্গে ন্যাটেব কর্কশ গলা ঃ সিঙ্গাপুবের কথাটা ভুলে যেও না ওলান!

ঘরে ঢুকে ওলান আগে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর অবসন্নের মত বসে পড়ল বিছানার ওপব। আমি একটা জানলা খুলে দিয়ে সিগাবেট ধরালুম।

সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত নাটকীয়। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে নাটকীয় পরিস্থিতি। আর নাটকীয় বলেই রোমাঞ্চকর। রাতের কোলকাতার মানুষ আমি। তাই এই বোমঞ্চটুকু মন্দ লাগছে না।

ওলানকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি তো গায়েশা মেয়ে। ন্যাট্‌কে ফিরিয়ে দিলে কেন?

দুই হাতের ওপর মুখ রেখে চুপ করে বসেছিল ওলান। মুখ তুলে বললে, পয়সা দেয় বলে মেয়েদের ও খোলামকুচি মনে করে।

বললাম, পয়সা তো আমিও দিয়েছি। লী সনের হাতে নগদ করকরে দুশো টাকা। আমিও যদি টাকার দাম উসুল করতে চাই ?

ওলান আস্তে আস্তে উঠে এল আমার কাছে। শুকনো একটু হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। বললে, তুমি তা পার না। তুমি হ্যাট্ নও।

বললাম, অর্থাৎ আমি হ্যাটের মত চালাক নই—এই বলতে চাইছ তো ?

ওলান বললে, না। বলতে চাইছি যে, তুমি কখনোই হ্যাটের মত নিষ্ঠুর জানোয়ার হতে পার না।

বললাম, তোমার বিশ্বাসের জন্যে ধন্যবাদ ! কিন্তু নারীকে পুরুষ ভোগ করতে চাইলেই কি নিষ্ঠুর জানোয়ার হয় ?

ওলান এ কথার জবাব দিলে না। আমার দিকে পিছন ফিরে শুধু বললে, পিঠের বোতামগুলো খুলে দাও তো !

থতিয়ে গিয়ে বললাম, কেন ?

ওলান বললে, খুলে দিলেই জানতে পারবে।

একে একে ফ্রকের চারটে বোতাম খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ আমার যেন আটকে গেল ওলানের পিঠে। উজ্জ্বল বাতির আলোয় তার নীবিবন্ধের ওপরে আর নীচে ধবধবে চামড়ায় কয়েকটা লাল দাগ। আদিম বর্বরতার নির্লজ্জ চিহ্ন।

স্তম্ভিত হয়ে বললাম, একি !

ওলান আমার দিকে ফিরল। একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, কাল রাতে একটা জানোয়ার আক্রমণ করেছিল আমাকে। তার নাম হ্যাট্ !

হ্যাট্‌কে তুমি আগে চিনতে ?

চিনতাম।

কি সূত্রে ?

গায়েশা হবার আগে ন্যাট্ আমার স্বামী ছিল। ও ছিল তখন সেলার। ওর আসল পেশা ছিল চোরাই জিনিসের কারবার।

এমন লোককে তুমি বিয়ে করলে কেন ?

আগে জানতাম না। জানতে পারার পর বিয়ে নাকচ করে আমি গায়েশা হয়ে যাই। তবু মাঝে মাঝে ও টাকার জন্যে আমার ওপর উপদ্রব করত। ওরই অত্যাচারে সিঙ্গাপুর থেকে লী সনের সঙ্গে আমি পালিয়ে আসি।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। ফেলে দিয়ে বললাম, কিন্তু কলকাতায় তোমার সন্ধান ন্যাট্ পেল কি করে ?

লী সনও যে চোরাই কারবার করে।

ওলান বিছানার তলা থেকে কি একটা জিনিষ বের করে এনে আমার হাতে দিল। দেখি, সেই রিষ্টওয়াচ। ওলান বললে, এটা লী সনের ঘর থেকেই পেয়েছি, ম্যানিব্যাগটা কিন্তু পাই নি।

হঠাৎ যেন লজ্জা পেলাম। মনে পড়ে গেল আগের দিন রাত্রে ওলানের কথা ঃ আমি চোর ! আমায় চোর বলছ জেন্টিলম্যান !

বললাম, আমি সরি ওলান !

ওলান বিষণ্ণ একটু হাসলে। তারপর আমার হাত ধরে এনে বিছানায় বসিয়ে বললে, আমি কিন্তু তোমার কাছে কৃতজ্ঞ জেন্টিলম্যান। আজ তুমি না এলে আমার রক্ষা থাকত না।

বললাম, আজ না হয় তুমি রক্ষা পেলে, কিন্তু ন্যাট্ যদি আবার আসে ?

খুব স্বাভাবিক। আর ন্যাট্ না এলেও ন্যাটেরই মত আর একটা জানোয়ার আসবে। লী সন বিনা স্বার্থে আমাকে নিয়ে আসে নি।

এখান থেকে তুমি পালিয়ে যাও না কেন? এই শয়তানের আড্ডা থেকে?

কোথায় যাব?

হঠাৎ জবাব খুঁজে পেলাম না। একটু ভেবে বললাম, এই কোলকাতা শহরে কয়েকটি মিশনারী আশ্রম আছে—ধরো সেখানে; অথবা আর কোন নিরাপদ আশ্রয়ে?

সাদা গালের ওপর দীর্ঘ পল্লবের ছায়া ফেলে চুপ করে রইল ওলান অনেকক্ষণ। তারপর 'ছোট ছোট ঘন কালো চোখ ছুটো আমার মুখের দিকে ফিরিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার তোমার সঙ্গে?

সে-রাতে সেই ছোট ছোট ঘন কালো তারা ছুটির মধ্যে কি দেখেছিলাম জানি না—বোধ হয় আত্মসমর্পণের ভাষা। হয়তো বা যৌবনের আমন্ত্রণ। চোখে চোখ রেখে বললাম, পারি।

চোখ না সরিয়ে ওলান বললে, সত্যি করে বল?

সত্যি করেই বলছি।

তবে নিয়ে চল আমাকে।

এখনই?

না। ন্যাট্ আর লী সনের ছু'জোড়া চোখ সব সময়ে পাহারা দিচ্ছে। আরও পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে হবে তারপর ৩১শে ডিসেম্বরের রাতে ওরা যখন হোটেলে নিউ ইয়ার্সের হুল্লোড়ে মেতে উঠবে, তখন তুমি গলির মোড়ে অপেক্ষা কোরো—ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব।

বললাম: বেশ, তাই হবে। কিন্তু ওলান, তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে যেতে পারবে? তোমায় আমায় মাত্র ছুটো রাতের আলাপ।

তবু পারব।

ধরো, ভবিষ্যতে তোমাকে যদি কষ্ট দিই ?

দিও। তবু একটু ভালবেসো আমাকে। জীবনে আমি কখনও ভালোবাসতে পারি নি, ভালবাসাও পাই নি !

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, সাদা গালের ওপর দীর্ঘ পল্লবের ছায়া বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে তরল মুক্তো ! ছ'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে ডাকলাম, ওলান !

কান্নাভেজা মুখে ওলান মৃছ হাসল। নারীর ঠিক এই হাসি আগে কখনও দেখি নি। মুগ্ধ হয়ে বললাম, আমি যদি কবি হতাম, তোমার নাম দিতাম চেরীফুল।

চোখের ছুটি তাবা উজ্জ্বল কবে ওলান বলে উঠল, কি বললে ?

চেরীফুল।

সাদা গাল গোলাপি হয়ে উঠল। আর তারই ওপব নেমে এল সরু সরু পল্লবের দীর্ঘ ছায়া। কানে কানে কথা বলার মত ওলান বললে, আবার বলো !······

আবার ডাকলাম, চেরীফুল।

ওলান সাড়া দিলে না। আমার কাঁধে মাথাটি ঠেকিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে।

আশপাশের কোন বাড়ীতে অত রাত্রেও গ্রামোফোন বাজছিল। সুরটা আমার চেনা। ব্লু ড্যানিয়ুব। সেই সুরের স্রোতে বড়দিনের রাতের মুহূর্তগুলি ভেসে ভেসে চলে যেতে লাগল। সেই সুরের গভীরতায় কথা হারিয়ে গেল আমাদের ছজনের। রাতচরা পথিক আমি, আর গায়েশা মেয়ে ওলান। ওলান তো নয়, চেরীফুল !

দেখতে দেখতে রাত পোহাল। ভোর হয়ে গেল যেন আরব্যো-পন্যাসের একটি রাত।

বললাম, এবার যাই চেরীফুল।

ওলান উঠে দরজার দিকে এগোল। সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সদরে পেঁছিতেই ওলান আমার হাত ধরে বললে, মনে থাকবে তো জেন্টিলম্যান? ৩১শে ডিসেম্বর, রাত বারোটা, চার্চে যখন নূতন বছরের ঘণ্টা বাজবে—

মনে থাকবে।

চেরীফুলের জন্যে অপেক্ষা করো তুমি।

কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর রাতে আসে নি চেরীফুল।

একে একে গির্জার সব ঘণ্টা বেজে গেল। পুরোন বছর গেল, এলো নতুন বছর। তবু এল না গায়েশা মেয়ে ওলান। সারারাত পথের ধারে অপেক্ষা করে ফিরে গেলাম আমি।

পরদিন গেলাম লী সনের হোটেলে। জিজ্ঞেস করলাম, ওলানকে দেখছি না যে!

কেমন অদ্ভুত হেসে লী সন বললে, ওলান এতক্ষণ জাহাজে।

জাহাজে?

ন্যাটের সঙ্গে কাল সিঙ্গাপুর পালিয়েছে।

কে যেন আমাকে হঠাৎ ধাক্কা মারলে। চেঁচিয়ে উঠলাম: মিথ্যে কথা! ন্যাটের সঙ্গে সে যেতেই পারে না।

তিনটে সোনা-বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে লী সন বললে, গায়েশা মেয়েদের তুমি চেনো না জেন্টিলম্যান। ওরা সব পারে।

আর কিছু শুনতে ইচ্ছে হল না। বেরিয়ে গেলাম।

সপ্তাহখানেক পরে পার্ক ষ্ট্রীটে এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে যাচ্ছিলাম।

কলকাতা ভাল লাগছিল না। যোধপুরে মিলিটারী চাকরির জন্যে দরখাস্ত করব ঠিক করেছিলাম। গত পরশু তাই ফোটো তুলিয়ে গেছি। আজ ফোটো নেবার তারিখ।

ঘরে ঢুকতে ফোটোগ্রাফার বললে, আপনার কথাই ভাবছিলাম। এক আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে।

আশ্চর্য কাণ্ড?

ভৌতিক কাণ্ডও বলতে পারেন।

বটে! ব্যাপারটা খুলে বলুন।

ফোটোগ্রাফার বললে, পরশু আপনি সিটিং দিয়েছিলেন, মনে আছে তো?

আছে।

ষ্টুডিওতে সেই সময় আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না, নিশ্চয়ই মনে আছে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

অথচ এই দেখুন···বলে' একখানা বড় খাম আমার দিকে এগিয়ে দিল। খামের ভেতর থেকে তিন কপি ফোটো বের করতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

প্রত্যেকখানা ফোটোতেই আমার চেহারার ঠিক পেছনে আর একটা ঝাপসা মূর্তি!

কিন্তু ঝাপসা হলেও চিনতে আমার ভুল হয় নি। সে-মূর্তি ধবধবে সাদা ফ্রকপরা গায়েশা মেয়ে ওলানের। বড়দিন-রাতের চেরীফুল!

পরদিন খবরের কাগজে নিচের সংবাদটি বেরোল ঃ

গতকল্য ছাতাওয়ালা গলির কোন বাড়িতে একটি ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে পুলিস একটি চীনা তরুণীর মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছে। অনুমান তরুণীটিকে সপ্তাহখানেক পূর্বে খুন করা হইয়াছিল। পুলিস এ সম্পর্কে ন্যাট্ নামক একজন ফিরিঙ্গি ও লী সন নামে একজন চীনাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অনেকদিনের পুরোনো সেই ফোটোগ্রাফখানা দেখতে দেখতে থিয়োজফিষ্ট বন্ধু বলছিলেন···ওলানের জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল তোমাকেই কেন্দ্র করে। আর, সে-আশা পূর্ণ হতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। তাই ওলানের প্রেতাত্মা সদ্গতি লাভও করে নি, তোমার সঙ্গও ছাড়তে পারে নি। সেই ৩১শে ডিসেম্বর রাতে তোমার চেরীফুল তোমার সঙ্গে প্রতারণা করে নি—এটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই সবসময় সে তোমার পিছু ঘুরে বেড়িয়েছে। অথবা তুমিই তাকে ভুলতে পার নি বলে' তোমারি আকর্ষণে ফোটো তোলার সময় সে এসে দাঁড়িয়েছিল তোমার পিছনে !

হয়তো বন্ধুর কথাই সত্যি !

আজও ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় যখন গির্জার ঘণ্টাগুলি নববর্ষ ঘোষণা করতে থাকে, তখন স্পষ্ট শুনতে পাই—কে যেন বহুদূর থেকে বলছে ঃ মনে আছে তো জেন্টিলম্যান ? ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটায় তুমি অপেক্ষা করো, তোমার চেরীফুল নিশ্চয়ই আসবে !······

—

তাসের ঘর

কলাবাগানের দলটাই সবচেয়ে জমকালো। সবচেয়ে জমকালো বলেই বোধহয় সবচেয়ে শেষে আসছে। প্রথমে আসছে আগুন-খেলা, বড় বড় লাঠির মাথায় আলকাতরা-মাখানো চটের জ্বলন্ত পুঁটলীগুলো ক্ষেপে-যাওয়া দৈত্যের রক্ত-চক্ষুর মত বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। কারবালার মাতনের নেশায় আগুন-খেলোয়াড়রা গ্রাহ্যই করলে না আগুনের সেই প্রচণ্ড আঁচকে। তানের পেছনে আসছে মাদার। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঁচু বাঁশের গায়ে রঙীন পাটের বড় থোপনা ব্যাণ্ডের তালে তালে পুরুষ-নাচিয়েদের বাবরী চুলের মত নাচছে। তারও পেছনে আসছে তাজিয়া দুলদুল্‌ ঘোড়া। কলাবাগানের দলটা শুধু জমকালো নয়, বড়ও। আসছে তো আসছেই। রাজাবাজারের ট্রামডিপো থেকে পাশিবাগান অবধি বড় রাস্তাটা জুড়ে রয়েছে।

সার্কুলার রোডের দু-পাশের ফুটপাত জুড়ে মহরমের মেলা বসেছে। কুলো-ডালা ধামা থেকে শুরু করে ছত্রিশ রকমের দোকানদানি। প্রতি বছরই বসে। যত ভিড় হয় মহরমের মিছিলে, তার দুনো দু-পাশের মেলার দোকানদানিতে।

কলাবাগানের মিছিল বেরোল পড়তি বেলায়—দিনের আলো যখন নিবু-নিবু। এত বেলায় মিছিল বেরোয় না, রোদ চড়া থাকতেই মানিকতলার কারবালায় সব জমায়েত হয়; কিন্তু এবার হল কি, দুপুরের দিকে গুর্‌গুর্‌ করে মেঘের জগঝম্প বাজিয়ে ঘটা করে বৃষ্টি নেমে এল হঠাৎ। ঘণ্টা দুই-আড়াই মিছিল বেরোন তাই বন্ধ ছিল। বৃষ্টিতে মেলাও খানিকটা ছত্রভঙ্গ হয়েছিল।

এখন এই পড়ন্তি বেলায় আবার জমে উঠেছে। লোকে গিস্‌গিস্‌ করছে দু পাশের ফুটপাত।

রঙীন থোপ্‌নাওয়ালা বাঁশটা আরেকজনের হাতে দিয়ে মিছিলের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল হাবু। কলাবাগানের দল তখন বাহির মীর্জাপুরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই জায়গায় বরাবর পান্নালালের সঙ্গে তার দেখা করার কথা।

হাবু ঠিক কি জাতের, বোঝা মুস্কিল। মহরমের মিছিলে তাকে যেমন বাঁশ নাচাতে দেখা যায়, গাজনের মেলাতেও তেমনি 'বাবা তারকনাথের চরণে স্যাবা লাগে' বলে' চীৎকার করতেও শোনা যায়। হাবুর নামের পিছনে যে-পদবীটা আছে, সেটা তাঁর বাপ-মায়ের দেওয়া নয়, পুলিশের দেওয়া। সে-পদবী আন্তর্জাতিক। লোকেরা হাবুকে বলে—হাবু গুণ্ডা! হাবু এই নামেই সুবিখ্যাত।

মিছিল থেকে বেরিয়ে হাবু যখন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তার গায়ের জালি-গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে সপ সপ্‌ করছে। বাঁশ নাচানোর জন্যে কোমরে বাঁধা গামছাটার গেরো খুলে কপাল আর ঘাড়টা বেশ করে মুছল, তারপর হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করে ধরাতে যাবে, এমন সময় তার মুখের ওপর সস্তা-সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া এসে পড়ল। হাবু দেখলে একটা চার্মিনার ধরিয়ে পান্নালাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এনায়েৎ সর্দারের দলের পকেটমার পান্নালাল। স্ট্রাণ্ড রোড থেকে বড়বাজার অবধি যার এলাখা। চকোলেট রঙের ভেলভেট কর্ডের লংপ্যাণ্ট আর আওয়ারা শার্টে পান্নালালকে ভদ্রলোক বলে ভুল হয়ে গেল হাবুর।

কিরে, উজবুকের মত তাকিয়ে আছিস কেন?—ধোঁয়া ছেড়ে পান্নালাল বললে।

তার মুখ থেকে ফস্ করে সিগারেটটা টেনে নিয়ে হাবু বললে, তোকে কেমন ভদ্দর-লোক দেখাচ্ছে মাইরি !

পান্নালাল প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললে, তবে ! আমি কি শালা তোর মত লোফার আছি ?

জবাব না দিয়ে হাবু একটানে প্রায় অর্ধেকটা সিগারেট পুড়িয়ে ফেললে। পান্নালাল আবার বললেঃ বলি আজকের মেলায় কারবার কিছু হল ?

বুড়ো আঙ্গুল্ দেখিয়ে হাবু সংক্ষেপে জবাব দিলে, লবডঙ্কা !

দিনভোর কেবল বাঁশই নাচালি ? বেকুব !

আর বলিসনে, পুলিসের জ্বালায় মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে। একটা পাঁট্ খাওয়া দিকি দোস্ত !

আরেকটা চার্মিনার ধরিয়ে পান্নালাল বললে, আমায় কি কাপ্তেন দুনির্চাদ পেয়েছিস যে চাইলেই—এই হেবো, কম অন্ কুইক !

ফুটপাথের ভিড়ের ওপর চোখ রেখে পান্নালাল একটু দ্রুত এগিয়ে গেল। পেছনে হাবু।

ময়লা-ফেলা রেল লাইনের ধারে ধারে দোকানদানি বসেছে। বেশীর ভাগই কুলো-ডালা, চাকি-বেলুন, তারের খাঁচায় বুনো টিঁয়া আর রঙ-ছোপানো চড়ুই পাখির সওদা।

আশু মুখুজ্যে প্যাটার্নের এক ভদ্রলোক মুখে মস্ত একজোড়া গোঁপ নিয়ে পাখি খরিদ করছিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোকের চেয়ে অন্তত বিঘতখানেক লম্বা। আর তাঁদেরই ঘিরে গুটি আষ্টেক খুচরো ছেলেমেয়ে থেলো হুঁকোয়-বাঁধা কড়ির মত চারিদিকে ঘিরে আছে।

এক ডজন রঙ-করা চড়ুই ভর্তি একখানা খাঁচা তুলে ধরে পাখিওলা বলছিল, আসল সিঙ্গাপুরী ক্যানারি বাবু! ছ'টাকা ডজনের কম পোষায় না।

ভদ্রলোক অমায়িক মুখে বললেন, তা কেমন করে পোষাবে বল? সিঙ্গাপুর থেকে আমদানী।

তুমি থামো! ভদ্রলোকের স্ত্রী ধমকে উঠলেন, ওই ফুটকুড়ি পাখিগুলোর দাম ছ-টাকা? মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি?

ভদ্রলোকের সুর পালটে গেল। বটেই তো! ছ-টাকা বললেই হল!

পাখিওলা বললে: লিন না, তিনটে টাকা দিয়ে লিয়ে যান। পর্তাত বেলায় দরাদরি করব না।

ভদ্রলোক মোলায়েম গলায় বললেন: হ্যাঁ, এইবার ন্যায্য দাম বলেছ বাপু! বলে' পকেট থেকে বোধকরি মানিব্যাগ বের করতে যাচ্ছিলেন, ভদ্রমহিলা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, দর করছি আমি, তোমায় ফোড়ন কাটতে কে বলেছে শুনি?—পাঁচ সিকের এক পয়সাও বেশি দোব না।

সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, কভি নেহি। পাঁচ সিকের এক আধলাও বেশি নয়!

তুলে-ধরা খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পাখিওলা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, পান সিকেতে সিঙ্গাপুরী চিড়িয়া মেলে না বাবু। এ হল জাত ক্যানারি, শিস যা দেবে, প্রাণ তর হয়ে যাবে শুনলে।

বটে! ভদ্রলোকের নিচের পুরু ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল। ভালো শিস দেয় বুঝি!

পাখিওলা সগর্বে বললে, শিস বলে শিস, একেবারে ব্যাগপাইপ বাজিয়ে দেয় বাবু! এ হল জাত ক্যানারি।

বছর নয়েকের একটা কালো মেয়ে ভদ্রলোকের হাত ধরে ঝুলে

পড়ল। নাকি সুরে বলে উঠল, এঁই পাখি নেঁবো বাবা। শিঁসওলা পাঁখি।

ভদ্রমহিলা ধমকে উঠলেন, থাম বলছি ভূতি!......

ভূতি আরেক পর্দা গলা চড়িয়ে বলে উঠল, পাঁখি নেঁবো, শিঁস্ওলা পাঁখি।

পাখিওলা এবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললে, লিয়ে লিন না মা, খুঁকি বায়না করছে! পুরো দুটো টাকাই দেবেন।

ভদ্রলোক গদগদ হয়ে উঠলেন, মাত্তর দু টাকায়!

ভদ্রমহিলার সেই এক কথা: পাঁচসিকের এক পয়সাও বেশি না।

পাখিওলা খাঁচাটা আবার তুলে ধরলে। বললে, আর চার আনা দিয়ে লিয়ে যান, বহুত লোকসান হয়ে গেল। কি করব, খুঁকির পসন্দ হয়েছে—লিয়ে যান মা—

ভদ্রমহিলা খাঁচাটা তার হাত থেকে নিয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, সত্যিই শিস দেবে তো?

পাখিওলা বললে, আলবৎ! দু-বেলা ব্যাগপাইপ বাজিয়ে দেবে। লেকিন এ-পাখিকে কখনও চান করাবেন না মা, তাহলেই গলা ধরে যাবে—

হঠাৎ ভদ্রলোকের পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, গলা ধরে যাবে, না সিঙ্গাপুরী ক্যানানির রঙ ধুয়ে যাবে ইয়ার?

ভদ্রলোক ব্যাগ খুলে দাম দিতে যাচ্ছিলেন। থেমে গেলন। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, আওয়ারা শার্ট গায়ে চুল ওলটানো একটি নব্য ছোকরা তাঁর পাশে।

ছোকরাটি বললে, এইসব রাস্তার পাখিওয়ালাদের একদম বিশ্বাস করবেন না স্যার। রঙ-করা চড়ুইগুলোকে স্রেফ ক্যানারি বলে চালিয়ে দেয়। খবরদার কিনবেন না।

ভদ্রলোকের হাত থেকে মানিব্যাগটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়েই ছোকরাটি তাঁরই পকেটে গুঁজে দিল।

লুঙ্গি গুটিয়ে পাখিওলা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছে। চটে গিয়ে বললে, তুমি কে হে লাটবাহাদুর? রং-করা চড়ুই বললেই হল?

প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছেলেটি গম্ভীর মুখে বললে, সিওর। এইসব চারশো-বিশের কারবার ছেড়ে দাও ইয়ার। তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললে, বাড়ি যান স্যার! পাঁচ সিকে দিয়ে গোটাকতক রঙ-করা চড়ুই কিনে লাভ কি বলুন?

ভদ্রলোক এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। দুজনের কথার মাঝখানে ফাঁক পেয়ে এবার বললেন, এই পাখিগুলো রঙ-করা চড়ুই!

পাখিওলা তেড়ে উঠল, না হুজুর! খাস সিঙ্গাপুরী ক্যানারি— কালী কসম!

ছোকরাটি বললে, বেশ তো, এখুণি প্রমাণ হয়ে যাক। ওই সরবতের দোকান থেকে খানিকটা জল চেয়ে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি— ক্যানারি না চড়ুই। এইখানে দাঁড়ান স্যার।

সরবতের দোকানের দিকে ছোকরাটি পা চালিয়ে দিল। আর ভদ্রলোক সপরিবারে দাঁড়িয়ে রইলেন, সিঙ্গাপুরী ক্যানারির ভেতর থেকে কেমন করে কলকাতার চড়ুই বেরিয়ে পড়ে—এই আজব তামাসা দেখবার জন্যে।

কিন্তু তামাসাটা তাঁরই ওপর দিয়ে হবে, অতটা ভাবতে পারেন নি।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তো দাঁড়িয়েই আছেন। ছোকরার পাত্তাই নেই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও তার টিকিও দেখা যায় না।

ছোকরা 'জল আনতে যাচ্ছি' বলায় পাখিওলা হঠাৎ কেমন

মিইয়ে গিয়েছিল। আবার গরম হয়ে বললে, দেখলেন ত বাবু, ছোকরা কেমন হাওয়া কাটলো? শালা রঙবাজির জায়গা পায়নি! লিন বাবু, আর ঝামেলা বাড়াবেন না, দাম ফেলে দিয়ে পাখী লিয়ে যান।

সত্যিই তো, ঝামেলা বাড়াবার দরকার কি? ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, এই দিই। তারপর লংক্লথের পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়েই আর্তনাদ করে উঠলেন, এ্যাঁ!

ভদ্রমহিলা ধমকে উঠলেন, ঢং করছ কেন? কি হল কি?

ভদ্রলোক ককিয়ে উঠলেন, আমার মানিব্যাগটা নেই!

পাখীওলা লাফিয়ে উঠল, বলেন কি! বেগ নেই? এ সেই শালা রঙবাজের কাজ বাবু।

ভদ্রলোক একটা ঢোঁক গিলে বললেন, কিন্তু ব্যাগটা নিয়ে আমার পকেটেই যে রেখে দিলে।

ও হাত-সাফাইয়ের ভেলকি! শালা এক নম্বরের পকেটমার আছে।

পাখীর খাঁচাটা নামিয়ে বেখে ভদ্রমহিলা খবখরে গলায় আবার ধমকে উঠলেন, এমন ভীমরতিও মানুষের হয়! পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিল, আর জল-জ্যান্ত মানুষটার হুঁশ নেই! নাও, খুব পাখী কেনা হয়েছে, এবার চল।

অনুতাপে চোখের জল গড়িয়ে এসে তখন আশু মুখুজ্যে প্যাটানে'র গোঁফজোড়া ভিজিয়ে দিয়েছে।

মহরমের শেষ মিছিল কলাবাগানের দল তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলায় আকাশের নীচে হুলহুলের ছেলেরা বুক চাপড়ে

বিলাপ করছে, ইয়া হোসেন! ইয়া হোসেন! কারবালার মসজিদ আর বেশিদুর নয়। দু-পাশের ফুটপাথে ভাঙা মেলার ভিড় আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

মিছিলের পাশে পাশে গা ভাসিয়ে চলেছে পান্নালাল। যুগী-পাড়ার কাছাকাছি এসে ভিড় থেকে খানিকটা তফাতে এসে সে একটা চার্মিনার ধরাল। একটু পরেই ভিড় থেকে বেরিয়ে এল আর একটি মূর্তি। গায়ে জালি গেঞ্জি, পরনে হাফ প্যাণ্ট আর ব্রাউন কেডস্। হাবু।

পান্নালালকে দেখে হাবু একগাল হাসতেই তার হাঁ-এর ভেতর থেকে পান-খাওয়া মেটে রঙের জিভের ডগাটা দেখা গেল। হাবু বললে, সাবাস দোস্ত! জবর কারবার করেছিস। পাঁটের দাম তো মিলে গেছে, চল্!

ঠোঁটের কোণায় সিগারেটটা চেপে পান্নালাল বললে, ননসেন্স। দাঁড়া, আগে দেখি রেস্তো কত আছে।

প্যাণ্টের পকেট থেকে পান্নালাল কি একটা জিনিস বের করে আনল। কুমীরের চামড়ার একটা ছোট মানিব্যাগ। সেটা খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরোল পাঁচ টাকার একটা নোট আর সাড়ে ন' আনা খুচরো পয়সা।

খালি ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পান্নালাল বলে উঠল, রাবিশ! মোটে পাঁচ টাকা! মজুরী পোষাল না রে হেবো।

হাবু বললে, ঠিক আছে। ওইতেই গলা ভিজিয়ে লিই চল্—রাতে তো এনায়েৎ মিঞার ডেরায় মাইফেল আছে। তখন আবার—

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দে হাবুর কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। দেখা গেল, মেলার ভিড়টা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাকা খেয়ে চারপাশে

ছিটকে পড়ছে। তুলছুলের একটা ঘোড়া নাকি বেমক্কা-রকম ক্ষেপে গেছে।

যুগীপাড়া লেনের মুখটায় দাঁড়িয়েছিল পান্নালাল আর হাবু। ফুটপাথের ভিড়ের চাপে সাদা মতন কি যেন একটা ছিটকে এসে পড়ল তাদের সামনে। দিনের আলো তখন ফেরারী আসামীর মত গা ঢাকা দিয়েছে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে। তার উপর দিনভোরই আকাশে ছেঁড়া মেঘের চাঁদোয়া খাটানো। ওদের তাই ভাল করে ঠাহর হল না জিনিসটা কি। ভেবেছিল কারোর গায়ের সাদা চাদর কিংবা সাদা শোলার একটা খেলনা-টেলনা কিছু। কিন্তু জিনিসটা হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠাতেই পান্নালাল একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল।

হাবু তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে শূন্যে তুলে ধরে বলে উঠল, আরে, এ-শালা একটা মানুষের বাচ্ছা!

পান্নালাল এবার দেখলে, সত্যিই তাই। মানুষের বাচ্ছাই বটে। ঘি-রঙের সার্টিনের নিকার-বোকার-পরা ফুটফুটে নাছুস-নুতুস একটা ছেলে। বয়স কতই বা হবে? বড়জোর তিন-চার বছর। ভিড়ের ভেতর থেকে ছিটকে পড়ার দরুণ কোঁকড়ানো কালো চুলের নীচে ছোট কপালটা একটু ছড়ে গেছে।

বনমানুষের মত হাবুর দুটো লোমশ বাহু ছেলেটাকে হঠাৎ শূন্যে তুলে ধরায় তার কান্না ভয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার রকম-সকম দেখে, হাবু মেটে রঙের জিভের ডগা দেখিয়ে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। ঘাবড়ে গিয়ে বাচ্চাটা আবার কান্না শুরু করে দিলে। ছোট ছোট নধর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষতে লাগল।

পান্নালালের কিন্তু হাসি পেল না, তার চোখের দৃষ্টি আটকে গেল নধর সুগোল দুটি কচি হাতের মনিবন্ধে—যেখানে চিক্‌চিক্‌

করছে সরু সরু প্লেন দু-গাছা সোনার বালা। চাপা গলায় হাবুকে সে ধমক দিয়ে বললে, চোপ শালা। বালা দুগাছা চট করে খুলে নে—কুইক্!

হাবুর হাসি মুহূর্তে থেমে গেল। চক্‌চক করে উঠল তার চোখ দুটো।

পান্নালাল বললে এখানে নয়। ওই বাড়ির রোয়াকে নিয়ে যা।

ছেলেটাকে তেমনি শূন্যে ঝুলিয়ে হাবু তৎক্ষণাৎ অদূরে একটা বাড়ির অন্ধকার রোয়াকের দিকে পা চালিয়ে দিল। ছেলেটা তখন চিল-চেঁচান চেঁচাচ্ছে।

কিন্তু হাবুকে দু-পায়ের বেশী আর এগোতে হল না। ছেলেটার চেঁচানি শুনেই হোক আর হাবুর কপাল দোষেই হোক, রাস্তার লোকের নজরে পড়ে গেল সে।

এই—এই বেটা! ছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? কার ছেলে ও?

কয়েকজন তাড়া করে এল পেছনে পেছনে। হাবু একটু থতিয়ে গিয়ে বললে, কার আবার? আমার ছেলে।

তোর ছেলে! বেটা বলে কি! ঘটোৎকচের ছেলে কার্তিক!

বেটা নির্ঘাৎ ছেলেধরা। ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে।

মার বেটাকে—ডাক পুলিস—

হাবু আর সময় নষ্ট করলে না। লোকজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ছেলেটাকে ধপ করে রাস্তার ওপর নামিয়ে মুহূর্তে হারিয়ে গেল মেলার মধ্যে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পান্নালাল দেখল সবই। ছেলেটাকে ঘিরে তখন পরোপকারী জনতার ভিড় জমেছে।

কার ছেলে কে জানে—মেলা দেখতে এসে হারিয়ে গেছে নিশ্চয়ই—

কলকাতা শহর—পথে ঘাটে চোর-ছ্যাঁচোড়—

বাপ-মায়ের আক্কেলটা দেখুন—যদি সামলাতেই না পারবি, তবে এই কচি বাচ্চা নিয়ে ভিড়ে বেরোনো কেন!

বাড়ি কোথায় খোকা?

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে খোকা শুধু বললে, বায়ি দাব।

একজন বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন, বাড়ি তো যাবে, কিন্তু বাড়িটা তোমার কোথায়, সেইটেই যে সমস্যা।

আর একজন পরামর্শ দিলেন, উপস্থিত থানার জিম্মাতেই রেখে দেওয়া যাক্। বাড়ির লোকেরা আগে সেখানেই খোঁজ করবে নিশ্চয়ই।

কথাটা যুক্তিযুক্ত। পরোপকারীর দল একবাক্যে সায় দিলেন।

ঠিক এই সময় 'খোকন! খোকন!' বলে ডাকতে ডাকতে ভিড় ঠেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল পান্নালাল। তারপর রোরুদ্যমান ছেলেটিকে টপ করে কোলে তুলে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, আর কাঁদে না, চল, বাড়ি চল।

পান্নালালের আচরণ দেখে পরোপকারীর দল একটু হকচকিয়ে গেল। একজন প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কি—

বিনীতভাবে পান্নালাল জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভাইপো।

আরেক জন ফুঁসে উঠলেন, আচ্ছা লোক তো আপনি! ভাইপোকে ছেড়ে এতক্ষণ কোথায় হাওয়া খাচ্ছিলেন?

অপরাধীর মত মুখ করে পান্নালাল বললে, আজ্ঞে হাওয়া খাব কেন? ভিড়ের মধ্যে ঘোড়া ক্ষেপে—কোথায় যে ছিটকে পড়ল ছেলেটা—

একটা ছেলেধরা আপনার ভাইপোকে নিয়ে সটকাচ্ছিল, তা জানেন? ভাগ্যিস আমরা ধরে ফেললাম, নইলে কি হ'ত বলুন দেখি? আর কি ফিরে পেতেন?

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পান্নালাল বললে, কি বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ দেব—আচ্ছা নমস্কার।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে পান্নালাল দ্রুত পা ফেলে যুগীপাড়া লেনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রিক্সাখানাকে এগিয়ে আসতে দেখেই নতুন বাজারের পাশে চিৎপুরের এই কানা গলিটা হঠাৎ যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। খোলার ঘরের মেয়েগুলো দরজার পাশ থেকে আর একটু বেরিয়ে এল গলি-রাস্তার ওপর। কেউ কায়দা করে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল, কেউ খামকা হেসে উঠল খিলখিল করে, কেউ-বা দু বাহু তুলে খোঁপার কাঁটা খুলে নিয়ে আবার নতুন করে গুঁজে দিল।

এ-গলিতে রিক্সার আনাগোনা অবশ্য এই নতুন নয়। চিৎপুরের এই সব কানা গলিতে রিক্সাই আনাগোনা করে বেশী। দুপুরের দিকে মেয়েগুলো যায় সিনেমার ম্যাটিনী শো-তে—আর রাতে আসে বে-এক্কার মাতালের দল। কিন্তু আজকের রিক্সাতে পর্দা ফেলা কেন? এ পাড়ার মেয়ে-পুরুষ কোন সওয়ারীই তো পর্দা ফেলে যাতায়াত করে না! এখানে যে সবই বেপর্দা।

তবে আজ কে এল এখানে পর্দানশীন হয়ে?

সারি সারি খোলার ঘরগুলো পেরিয়ে পর্দা-ফেলা রিক্সাখানা এক বাই একের বি নম্বর কোঠাবাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একতলার

রামপিয়ারী আর কম্‌লি মরি-বাঁচি করে রোয়াকের ওধার থেকে ছুটে এল রিক্সার সামনে।

কিন্তু তার আগেই রিক্সার পর্দাটা তুলে জালি-গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট-পরা একটা লোক গামছা-জড়ানো কি একটা জিনিস কাঁধের ওপর ফেলে সাঁৎ করে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

হতাশ হয়ে কম্‌লি বলে উঠল, ও হরি! হেবো মুখপোড়া!

ওপরে দোতলার বাসিন্দা আঙুরবালা তখন একটা বেলোয়ারী আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে জরি-জড়ানো বিনুনিতে প্লাস্টিকের বেলফুল গুঁজছিল। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়েই চট করে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর চুনে-হলুদ রঙের সস্তা বেনারসীর আঁচলখানা ডান বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর বিন্যস্ত করতে লাগল।

পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি ছেড়ে ভেতরের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। আঙুর ডগমগ সুরে গুনগুনিয়ে উঠল :

চোখে চোখে রাখি হায় রে, তবু তারে ধরা—

দরজার দিকে তাকাতেই আঙুরের গান হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ঝুটো মুক্তোর নাকছাবি-পরা নাকটা সিঁটকে বলে উঠল, আ মরণ! তুই! আমি ভাবলুম দালালে বুঝি নোক আনছে।

উত্তরে দরজার সামনে হাবুর মুখের ভেতর থেকে মেটে রঙের জিভের ডগাটুকু দেখা গেল শুধু।

আঙুর আবার বললে, কোন্ চুলো থেকে আসা হচ্ছে শুনি? তোর স্যাঙাৎ কই?—ওমা, ওটা আবার কি তোর কাঁধে?

হাবু ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলে, মহরমের সওদা। তারপর কাঁধের গামছাচাপা জিনিসটা আস্তে আস্তে খাটের ওপর রেখে দিল।

মহরমের সওদা দেখে আঙুর আর একটু হলেই বেমক্কারকম চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কি! ফুটফুটে নাদুস-নুদুস একটা বাচ্চা ছেলে। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। পরনে ঘি-রঙের নিকার-বোকার, পায়ে ঘুমটি লাগানো ছোট্ট একপাটি জুতো। ছেলেটা ঘুমে একাবারে কাদা। লালচে পাতলা ঠোঁট দুখানা ঘুমের ঘোরে ফাঁক হয়ে গেছে, আর লাল গড়াচ্ছে কষ বেয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড আঙুরের যেন দম আটকে গিয়েছিল। দম নিয়ে সে বললে, ও মড়া! এ কার ছেলে নিয়ে এলি?

হাবু রসিকতা করে বললে, আমার বুনাইয়ের।

আঙুর বললে, মর মুখপোড়া! চুরি করে এনেছিস বুঝি?

হাবু জবাব দিলে, রাম কহ! চুরি করতে যাবো কেন! মাণিকতলায় মহরমের মেলায় কুইড়ে পেলুম।

বিরক্ত হয়ে আঙুর ঝাঁপিয়ে উঠল, হ্যাঁ, কুইড়ে পেলুম বললেই হল। তোর মত চোর-চোট্টার জন্যে পথে-ঘাটে কচি ছেলেরা ছড়িয়ে আছে, না? তা মরতে এই রাস্তার জঞ্জাল আমার ঘরে এনে জোটালি কেন? আমার বলে এখন নোক আসার সময়।

এতক্ষণে হাবুর মুখ দিয়ে সত্যি কথা বেরোল। বললে, পুলিসে পেছু নিয়েছিল। রাত্তিরটা তোর ঘরে রেখে দে।

আঙুর এবার রীতিমত রেগে গেল। বললে, মাইরি আর কি! আমার আর রোজগার করে দরকার নেই। যা, নিয়ে যা এখান থেকে, নইলে তোকে শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দোব।

হাবু গামছা দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, আমায় ডাঁট্‌ছিস কেন আঙুরী? দোস্ত এখেনেই পেঠিয়ে দিল তো আমি কি করব বল্‌!

কে পাঠিয়ে দিল? পান্না?

হাবু শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সে চুলোমুখো কোথায় শুনি ?

এনায়েৎ মিঞার ডেরায়। রাতভর মাইফেল চলবে। দোস্ত আজ আর আসবে না বলেছে।

আঙুর এবার পটকার মত ফেটে পড়ল। বললে, চোরের সাক্ষী গাঁট-কাটা। ওস্তাদের ডেরায় রাত কাটাবে, না বিমলির ঘরে ? আমার কাছে পট্টিবাজি করতে এসেছিস ? তোর দোস্তকে আমি চিনিনে ?

হাবু শশব্যস্তে বলে উঠল, রাম কহ। বিমলির ঘরে রাত কাটাবে কেন ? ওস্তাদের ডেরায় আজ যে মহরমের ফিষ্টি। দলের সবাইকে যেতে হবে।

আঙুর তবুও গজরাতে লাগল, আচ্ছা, আমারও নাম আঙুর-বালা। তোর দোস্ত যদি বিমলির চৌকাঠে পা দেয়, সে-খবর হাওয়ায় পাব আমি। দেখিস তখন কি করি। খানিকটা বিষ এনে আগে তাকে গেলাব, তারপর আমি নিজে গিলবো।

হাবু তার সেই পেটেণ্ট হাসিটি হেসে বললে : বাহবা ! একেই বলে পিরীত রে ! যাক, যা করতে হয় কাল করিস, আজকে চেপে আমি চলি।

ঘর থেকে হাবু বারান্দায় পা দিল। পেছন পেছন আঙুরও ছুটে গেল। চাপা গলায় বললে, আমার সাথে বেইমানি করিস নি হেবো। আমার পয়সায় অনেক মাল খেয়েছিস তুই। ও যদি আজ বিমলির ঘরে যায়, মাথা খাস, আমায় বলিস কিন্তু ভাই।

যেন ভারি একটা মজার কথা শুনেছে, এইভাবে হাবু এবার হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল, আর হাসতে হাসতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

তেতো মন-মেজাজ নিয়ে আঙুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। বিশ্বাস নেই পান্নালালকে। ওর মত গাঁটকাটা পকেটমার সব পারে। যতই যত্ন-আত্তি কর, আদর-সোহাগ দেখাও, ছোঁক-ছোঁকে স্বভাব ওর ঘুচবে না। ফাঁক পেলেই বিমলি কেন—রাণী, পটলি, পঞ্চি—যে কোন ডাইনীর ঘরেই দিব্যি রাত কাটিয়ে আসতে পারে। আবার বলে কিনা ভালবাসি! ঝাড়ু মারো অমন ভাল-বাসার মাথায়। পুরুষ জাতটাই হচ্ছে জংলা-পাখি। মরুক গে, যে চুলোয় খুশি যাক গে পান্না। আঙুরবালারও ফুর্তি করবার লোকের অভাব হবে না।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে আঙুর আবার ঘরে ফিরে আসতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ওই যা! ছোঁড়াটাকে ফেলে হেবো মুখপোড়া কেটে পড়ল যে! গলির ধারে জানলার দিকে ছুটে গেল আর। আবছা গ্যাসের আলোয় গলির পথটা ভালো করে ঠাহর করবার চেষ্টা করলে। হাবুর চিহ্ন মাত্রও কোথাও নেই। গলি পার হয়ে এতক্ষণে সে নিশ্চয় বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

জানলার কাছ থেকে সরে এল আঙুর। খাটের দিকে তাকাতেই তার তেতো মনের ওপর কে যেন খানিকটা লঙ্কাবাটা মাখিয়ে দিল। সে যা পছন্দ করে না, পোড়া বিধাতা কি তার কপালে তাই লিখেছে? কোন্ চুলো থেকে ছেলেটাকে গুম করে পাঠিয়েছে পান্নাই জানে। আঙুরের এই ঘরটা যেন চোরাই মালের আড্ডা! হেবো মুখপোড়া আবার বলে কিনা 'মহরমের সওদা' এনেছি। হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার!

এই কচি আপদ নিয়ে কি করবে এখন আঙুর? আজ শনিবার, রেসের দিন। এখনই হয়তো তার ঘরে লোক এসে পড়বে। তারপর হৈ-হল্লা আর হারমনি-তবলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়ে ছেলেটা

যদি প্যানপেনিয়ে কাঁদতে শুরু করে, তখন? শেষকালে টাকা ফেরৎ দিয়ে লোক তাড়াতে হবে নাকি? কি জ্বালা দেখ দিকি! বয়ে গেছে আঙুরের। প্যান্-প্যান্ করলেই ছোঁড়ার নড়া ধরে সোজা নামিয়ে দিয়ে আসবে একতলায় কমলির মেয়ের বিছানায়। আঙুর বালার কাছে খাতির নেই, হ্যাঁ।

হঠাৎ 'এই মরেছে!'—বলে' আঙুর দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল বিছানার দিকে। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে বাচ্চাটা একেবারে খাটের কিনারে এসে পড়েছিল। আঙুর হাত দিয়ে না ঠেকালে নির্ঘাৎ মেঝেয় পড়ে মরত। মনে মনে হাবুকে আর একবার গাল পাড়লে সে। এত বড় খাটে এতটুকু বাচ্চাকে শোয়াবার আর জায়গা পেলো না মুখপোড়া! শুইয়েছে একেবারে খাটের ধার ঘেঁষে।

বোধকরি কমলির ঘরে দিয়ে আসার জন্যেই আঙুর ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দু-হাতের মধ্যে তুলে নিল। কি তুলতুলে বাচ্চাটা! একতাল মাখন যেন, বা একমুঠো চাঁপাফুল! দু-হাতের মধ্যে বাচ্চাটাকে ধরে আঙুর কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল বাচ্চাটাকে। এতক্ষণ ভাল করে দেখেও নি ছেলেটাকে। ফর্সা, নাদুস-নুদুস, ফোলা ফোলা গাল, বোঁচা নাক আর একমাথা কালো পশমের মত চুল। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোন বাচ্চাকে এর আগে দেখে নি। ঘি-রঙের নিকার-বোকারটা ঘামে ভিজে গেছে। বাঁ-গালে ছোট্ট একটা তিল! একপায়ে জুতো নেই, শুধু মোজা। বাচ্চাটা যে ভাল ঘরের, আঙুর তা দেখেই বুঝতে পারল।

এই সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চেনা গলায় আওয়াজ: আঙুর বিবি আছ?

লাল্‌তা দালাল লোক আনছে।

তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে বিছানার মাঝখানে শুইয়ে দিলে আঙুর, তারপর দরজা-মুখো এগোতেই টান পড়ল শাড়িতে। ওমা ! আঁচল ধরে টানে কে ? পেছন ফিরে তাকাতেই আঙুর যেন কেমনতর হয়ে গেল। 'ঘুমের ঘোরে বাচ্চাটা কখন যে বেনারসীর আঁচলের একটা খুঁট ছোট মুঠির মধ্যে ধরে ফেলেছে, আঙুর তা জানতেই পারে নি। ছেলে ভারি তুখোড় তো ! ভুরু কুঁচকে তাকাতে গিয়ে আঙুরের হাসি পেয়ে গেল।

পায়ের আওয়াজ তখন বারান্দায় উঠে এসেছে। লাল্‌তা তার বাজখাঁই আওয়াজে আর একবার হাঁকলে, কই গো আঙুর বিবি !

এক ঝটকায় আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে আঙুর তার দরজায় সস্তা ছিটের পর্দাটা টেনে দিলে। তারপর পর্দার ফাঁকে শুধু মুখটুকু দেখিয়ে বললে, নিচে রামপিয়ারীর ঘরে নিয়ে বসাওগে, যাচ্ছি।

লালতার পেছনে টলটলায়মান কাপ্তেনবাবুটি দু-হাত জোড় করে বলে উঠল, আশায় রইলুম কিন্তু। দেখো ভাই নৈরেশ করো না।

পায়ের আওয়াজ সিঁড়ির নিচে চলে যেতেই আঙুর বেলোয়ারী আর্শির সামনে এসে দাঁড়াল। চুলটা একবাব ঠিক করলে, রঙ-লাগানো শুকনো ঠোঁট-দুটো জিভ দিয়ে একবার ভিজিয়ে নিলে। বেনারসীর আঁচলটা ঘুরিয়ে বুকের ওপর ফেলে আবার একটু সরিয়ে দিলে। একবার তাকিয়ে দেখলে, বাচ্চাটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এইবার রামপিয়ারীর ঘরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেতে গিয়ে আঙুর খাটের ধারেই ফিরে এল। ছেলেটা ভারি ছটফটে। কি জানি, ঘুমের ঘোরে আবার যদি গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে ? গোটা-কয়েক তাকিয়া নিয়ে আঙুর ছেলেটার চারপাশে বেড় দিয়ে দিল। একটা হাত পিঠের তলায় চলে গিয়েছিল। সেটা টেনে বের করতে

গিয়ে আঙুর দেখলে বাচ্চাটার পিঠ ঘামে সপ্ সপ্ করছে। হয়তো পাখার নিচে শোওয়া অভ্যেস। বুকে-পিঠে ঘাম বসে সর্দি করে যদি? এ কি রুক্কু ঝামেলা জুটিয়ে গেল হেবো মুখপোড়া!

মনে মনে হাবুকে উদ্ধার করতে করতেই আঙুর বাচ্চাটার ভিজে নিকার-বোকার খুলতে বসল।

বারান্দায় লালতা ডাকল, ও আঙুর বিবি!

ভেতর থেকে আঙুর জবাব দিলে, এই যাই। বলো গে যাচ্ছি!

অপটু হাতে নিকার-বোকারটা খুলতে গিয়ে ছেলেটা প্যাঁ করে উঠতেই আঙুর তাকে চাপড়াতে শুরু করলে। আচ্ছা ফ্যাঁসাদে ফেললে তো ছেলেটা! আঙুরের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যেন! কিন্তু ছেলেটাকে ভাল বলতে হবে। আঙুরের হাতের চাপড়ানিতে তার চোখের পাতা-দুটে আস্তে আস্তে আবার বুঁজে এল। অল্প ফাঁক হয়ে গেল লালচে পাতলা ঠোঁট দু-খানা।

আঙুর এবার উঠল। চারপাশের তাকিয়াগুলোকে আর একবার ঠিক করে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিচে রামপিয়ারীর ঘরে আঙুর গিয়ে যখন দাঁড়াল, তখন সেখানে মদের বোতল, কাটলেট, মায় বেলফুলের গোড়ে অবধি এসে গেছে। একটা গেলাস এগিয়ে দিয়ে রামপিয়ারী বললে, বোস্।

আঙুর কিন্তু ব'লে বসলো, আমায় আজ মাপ করতে হবে ভাই। দেহটা ভাল নেই।

গলায় বেলফুলের মালা পরে কাপ্তেনবাবুটি কাটলেট চিবোচ্ছিল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, সে কি কথা! প্রাণে বড় দুঃখু লাগবে মাইরি!

রামপিয়ারী বললে, দুখানা গানই না হয় গেয়ে যা।

গলাটা খুস-খুস করছে। কিছু মনে করিস নে।

আঙুর আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার মনে হল, একা ঘরে ছেলেটা ভয় না পেলেই বাঁচি।

কিন্তু ভয় পাবার ছেলে সে নয়। আঙুর যখন ঘরে ফিরে এল, খাটের ওপর বসে ছেলেটা তখন ড্যাবডেবে দুই চোখ মেলে ঘরের চারিদিক দেখছে। কেউ একসময় কাজল পরিয়ে দিয়েছিল, সেই কাজল গলে' মুছে চোখ দুটোর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন, দেখে আঙুর হেসে ফেলল। তাবপর একটু গম্ভীর হয়ে বললে, ও হরি! এই বুঝি ঘুম হচ্ছে!

আশ্চর্য, নতুন ঘরে নতুন লোক দেখেও ছেলেটা কাঁদছে না, বোধকরি মেয়েছেলে বলেই।

আঙুরের কথার উত্তরে সেও গম্ভীর ভাবে বললে, মাম যাব।

ভুরু কুঁচকে আঙুর বললে, মামটা আবার কে?

উত্তরে ছেলেটা শুধু বললে, মাম। তারপরেই তার পাতলা লালচে নিচের ঠোঁটখানা উল্‌টে গেল।

এই মরেছে! ছোঁড়া এবার পোঁ ধরলে নাকি? আঙুরের ইচ্ছে হল ঠাস করে চড়িয়ে দেয়, কিন্তু করে বসল উলটো কাজ। একটু যেন নরম গলাতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, যাব, যাব, মাম যাব। পাখী নিবি, পাখী? পুতুল? বেড়াল?

ছেলেটা বললে, বেয়াল নেবো।

হেঁট হয়ে আঙুর খাটের তলাটা দেখলে। মুখপোড়া পোষা বেড়ালটাও ঠিক এই সময় পালিয়েছে। সুর করে আঙুর ডাকতে লাগল, পুষি আয়—আয় পুষি!

হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে ছেলেটা বলে উঠল, কোয়ে।

আঙুরের ইচ্ছে হল বলে 'তোর বাপের চাকরানি পেয়েছিস আমাকে ?' কিন্তু বললে না কিছুই, নিঃশব্দে ছেলেটাকে কাঁকালে তুলে নিয়ে ঘরের কোণে যেখানে টিঁয়াপাখির খাঁচা ঝুলছে সেখানে এসে দাঁড়াল। পাখি দেখে ছেলেটা খুশি হল। বললে, পাতি নেবো।

আঙুর বললে, আচ্ছা দেবো। আর বায়না করবি নে তো ?

ঝাঁকড়া চুলশুদ্ধ মাথাটা এধার থেকে ওধারে নাড়িয়ে ছেলেটা জানাল, না।

তোর নাম কি রে ?

উত্তর এল, বুবু।

আঙুর একটু ঝাঁঝিয়ে বলল, ও আবার কি নাম ? একটা ভাল নাম রাখতে পারে নি তোর বাপ মা ?

বুবুর কি খেয়াল হল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার নাম ?

চোখ পাকিয়ে আঙুর বললে, আমার নামে তোর কি দরকার রে ফাজিল ছোঁড়া! তারপর গলা নরম করে বললে, আমার নাম আঙুর।

ববু প্রতিধ্বনি করলে, আমুর।

আমুর না, বল্ আঙুর।

বুবু আবার বললে, আমুর।

আচ্ছা, তাই সই। নে, এখন কোল থেকে নাম। কাঁকাল টন্‌টন্ করছে আমার।

বুবুকে আবার বিছানার ওপর বসিয়ে দিতে গিয়ে, ঘরের মাঝখানে আঙুর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। চোখ দুটো যেন আটকে গেল সামনের বেলোয়ারী আর্শির বুকে। চিৎপুরের এই কানা গলিতে যে-আঙুর আজ এগারো বছর বাস করছে, সে কখনও ওই

আর্শির ভেতরকার ছেলে-কোলে আঙুরকে দেখেনি। এ-আঙুর তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওই আঙুরের পানে!

বেনারসীর আঁচলটা টেনে আঙুরের মাথায় চাপিয়ে বুবু হঠাৎ বললে, ও আমুব! বৌ থাজো।

আঙুর আঁচলটা ভাল করে মাথায় টেনে দিতেই বুবু ভারি খুশি হয়ে উঠল। বারবার বলতে লাগল, বৌ—ও বৌ!

এবার আঙুরও না হেসে থাকতে পারল না। বললে, ভারি পাকা হয়েছিস তো! নে, নাম এবার!

বুবু কিন্তু খাটের ওপর বসল না, তিড়বিড় করে নেমে পড়ল ঘরের মেঝেয়। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এটা ওটা সেটা! আর খাটের ধারে বসে আঙুর সকৌতুকে দেখতে লাগল সেই দিগম্বর শিশু ভোলানাথটিকে।

মেঝেয় গদিপাতা ফরাসের ওপর আঙুরের সিঙ্গল-রীড হারমোনিয়াম ছিল। পিঁ করে বুবু তার একবার চাবি টিপল! তামার বাঁয়াটার ওপর গোলগাল নধর হাতের কয়েকটা চাপড় মারলে। তারপর আঙুরের পাউডারের কৌটোটা থাবা মেরে নিয়ে এসে বললে, থাজিয়ে দে।

ইস! ছেলের সখ দেখো না! পারব না, যা।—আঙুর আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল।

কিন্তু বুবু ছাড়বার পাত্র নয়। একহাতে আঙুরের হাঁটু ধরে সে আবার বললে, ও আমুর, থাজিয়ে দে না।

আঙুরকে অগত্যা মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে বুবুর প্রসাধন কাজে মন দিতে হল। পাউডার মেখে, চুল আঁচড়ে, কুম্‌কুমের ছোট টিপ পরেও বুবুর সখ মিটল না। আঙুরের গলায় পেণ্ডেণ্ট লাগানো সরু বিছে হারটা মুঠো করে ধরে বললে, আমি পব্‌ব—ও আমুর—

আঙুরের মেজাজটা ধাঁ করে গরম হয়ে গেল। হাবুর ওপর চাপা রাগটাই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল এবার। বুবুর পাউডার-লাগান গালে ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ভাগ!

আচমকা চড়টা মেরেই আঙুর ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এইবার বুঝি ছেলেটা কান্না জুড়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বুবু কাঁদলে না। চড়টা তার পক্ষে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুখখানি চুন করে আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে শুধু নিচের পাতলা ঠোঁটটা উলটে যেতে লাগল।

ডাকসাইটে ঝগড়াটে বলে আঙুরেব নাম আছে। পাড়ার মেয়েরাই বল, আর চিৎপুরের যত মাতাল-গুণ্ডা-বদমায়েসই বল, আঙুরের মুখের তোড়ে কেউই টিঁকতে পারে না। সে হেন আঙুর আজ কিন্তু অতটুকু ছেলের সামনে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। চড়টা না মারলেই হত। এমন কিছু জোবে মারে নি, তবু টেবো গালে তিনটে আঙুলের দাগ বসে গেছে।

আঙুর ডাকলে, এই শোন্, হার নিয়ে যা।

বুবু নড়ল না, আড়চোখে একবাব তাকিয়ে আবার গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবুর রাগ হয়েছে বুঝি!

হারটা নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল আঙুর। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বুবুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে!

বুবু এক কাণ্ড করে বসল। কচি গালে চড়ের দাগ নিয়েও যে ছেলে এতক্ষণ কাঁদেনি, এই আদরে সে হঠাৎ দু-হাত দিয়ে আঙুরের গলা জড়িয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। আঙুর কি করবে ভেবে পেল

না। বুবুকে থামাতে গিয়ে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। অবাক হল এই বুঝতে পেরে যে, তারও গলার কাছটায় কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। কি সেটা? কান্না? এমনও হয় নাকি? নেশার ঝোঁকে ভালবাসাবাসি নিয়ে কতবার সে পান্নালালের সঙ্গে কোঁদল করেছে, কেঁদে ভাসিয়েছে, কিন্তু সজ্ঞানে তো কোনদিন তার এমন হয়নি—এই একরত্তি ছেলের কান্না দেখে আজ যেমন হচ্ছে।

গলাটা সাফ করে বললে আঙুর, কাঁদে না, ছি! তোকে কত পুতুল কিনে দোব—ক-তো খেলনা—রেলগাড়ি—মটরগাড়ি—

কান্না ভুলে বুবু বলে উঠল, মটর গায়ি—ভোঁক-ভোঁক—

আঙুর হেসে বললে, হ্যাঁ—বুবু চড়ে বেড়াতে যাবে। আর কেঁদো না, কেমন? দেখো দিকি পাউডার ভিজে মুখখানার কি ছিরি হল!

বেনারসী আঁচল দিয়ে আঙুর বুবুর মুখ-চোখ মুছিয়ে দিলে। অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলে এবার।

পোষা বেড়ালটা কোন্ ফাঁকে আবার ফিরে এসেছিল, আঙুর তা খেয়াল করে নি। চোখ বুঁজে পরম সুখে কি একটা চিবোচ্ছিল। ড্যাবডেবে চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে বুবু জিজ্ঞেস করলে, বেয়াল কি খাচ্ছে?

আঙুর বললে, ও মাছের কাঁটা!

বুবু সোজাসুজি বলে ফেললে, আমিও মাছ খাব।

কি জ্বালা! মাছ এখন পাবে কোথায় আঙুর। সকালে রেঁধেছিল বটে ট্যাংরার ঝাল, কিন্তু রাতে তো রাঁধে না, দোকানের খাবারেই চলে যায়।

বুবু আবার বললে, ও আমুর, খিদে পেয়েতে—

তাই তো, এত রাত অবধি ছেলেটা মুখে কিছু দেয় নি যে!

তাড়াতাড়ি উঠে আঙুর গলির ধারের জানালায় এসে দাঁড়াল।
উল্টো দিকে একটা বিড়ির দোকান ঠাহর করে ডাকলে, এই বির্জু।

আধ-বুড়ো একটা খোট্টা এসে দাঁড়াল দরজা-গোড়ায়। ফুলকাটা কাচের গ্লাসটার ভেতর থেকে একটা টাকা বের করে আঙুর বললে, চট্ করে একবার বড় রাস্তার দোকানে যা দিকি।

বির্জু বললে, পরটা আর কষা মাংস তো ?

আঙুর বললে, তোমার মুণ্ডু। এক পো গরম দুধ আনবি, বুঝলি ? আর, টাটকা দুটো সন্দেশ। যাবি আর আসবি।

আঙুরের ঘরে বির্জু খাবার আনছে বেশ কয়েক বছর ধরে। আজকের ফরমাস শুনে বির্জু কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর চলে গেল।

দুধ খেয়ে বুবু আর একবার বায়না ধরেছিল, 'মাম যাব'। কিন্তু অতি কষ্টে আঙুর তাকে শেষ অবধি ঘুম পাড়িয়ে দিল। সে জন্যে কম হাঙ্গামা করতে হয় নি আঙুরকে। চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছে, ছড়াও গাইতে হয়েছে। ছড়া ঠিক নয়, সিনেমার গান গুন্‌গুন করে।

ছেলেটা ঘুমোলে আঙুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সস্তা বেনারসীখানা ছেড়ে আটপৌরে একখানা তাঁতের শাড়ি পরল। খুলে ফেলল খোঁপার জরি, খুলল ওপরের ব্লাউজ আর ভেতরের কাঁচুলী। ও-বেলার জল-দেওয়া চাট্টি ভাত আর তরকারী ছিল। খেতে বসে মুখে রুচলো না। হাত ধুয়ে উঠে বড় বাতিটা নিভিয়ে দিলে সে। তারপর নীল রঙের ছোট বাতিটা জ্বেলে বিছানায় বুবুর পাশে এসে বসল। আঙুরের মনে হল নিচে রামপিয়ারীর ঘর থেকে একবার ঘুরে এলে হয়। কিংবা বির্জুকে দিয়ে আনিয়ে নিলে হয় একটু মদ।

শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। কিন্তু উঠি-উঠি করেও আঙুর উঠল না। দিশি মদের গন্ধে ছেলেটা যদি ওয়াক তোলে ? থাকগে !

সত্যিই ক্লান্ত লাগছিল আঙুরের। আস্তে আস্তে বুবুর পাশে গা ঢেলে দিয়ে সে চোখ বুজল। ঘুম এল না, এলোমেলো চিন্তা মাকড়সার মত জাল বুনতে লাগল মাথার মধ্যে। সেই সন্ধ্যে থেকে এই মাঝরাত অবধি কি ঝামেলাই না পোহাতে হল তাকে। এমন একটা বেয়াড়া সন্ধ্যা তার জীবনে আসবে, আঙুরবালা কি কখনো ভেবেছিল ? সে কি ভেবেছিল এই শনিবারের রাতটি রেস-ফেরৎ মাতালের বদলে একটা কচি ছেলেকে নিয়ে কাটিয়ে দিতে হবে গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝির মত ? হেবো মুখপোড়ার জ্বালায় শনিবারের ফূর্তিটা মাঠে মারা গেল আঙুরের। যাক গে. একটা রাত বৈ তো নয়। হেবো তো বলেই গেছে শুধু একটা রাত রাখতে। কিন্তু তারপর ? আঙুর জানে তারপর কি করবে ওরা। দয়া মায়া তো নেই ওদের শরীরে। হয় বেচে দেবে ভিখারীদের আস্তানায়, যেখানে কচি ছেলেদের হাত-পা নুলো করে ভিক্ষে করতে শেখায়। নয়তো টাকার লোভে পশ্চিমের কোন্ শহরে চালান করে দেবে গাঁটকাটা দলের সঙ্গে। দিক গে, অঙুরের তাতে কি ? পেটের ছেলে তো নয়। উড়ে এসে জুড়ে-বসা এক রাতের আপদ।

ও-সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল আঙুর। কিন্তু কপালে তার আরো অনেক বাকি তখন।

ঘুমের ঘোরে বুবু একবার .কেঁদে উঠল। হাত বাড়িয়ে আঙুর চাপড়াতে শুরু করলে, আর চাপড়াতে চাপড়াতেই এক বিচিত্র মধুর অনুভূতিতে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুকের কাছটায় ছোট্ট প্রজাপতি যেন পাখা নাড়ছে। নীল রঙের ফিকে আলোয় আঙুর চোখ মেলে দেখলে, প্রজাপতি নয়, গোল গোল ফর্সা একখানা কচি

হাতের আঙুলগুলো তার বুকের ওপর খেলা করে বেড়াচ্ছে। সেই ছোট্ট হাতখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, ঘুমের ঘোরে বুবু তাকে নিশ্চয় তার মা বলে ভেবেছে। আর এই কথা ভাবতেই আঙুরের বুকের ভেতর থেকে একটা রাক্ষুসে ক্ষুধা বেরিয়ে এসে বুবুকে যেন দলে পিষে একাকার করে দিতে চাইল।

কিন্তু কিছুই করলে না আঙুর! বুবুর যে গালে তার তিনটে আঙুলের দাগ আঁকা আছে, তারই ওপর নিজের গালটা রেখে চুপ করে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। চোখের কোল বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জলের ফোঁটা বুবুর চুলগুলো ভিজিয়ে দিতে লাগল। পোড়া চোখে কোথায় যে এ জল লুকিয়ে ছিল, তা কি আঙুরই জানত!

তিরিশ বছরের বন্ধ্যা যুবতী আঙুরের বুকটা যেন একটা শ্মশান। কত পুরুষের কত কামনার চিতা এখানে জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে। কে জানত একখানা কচি হাতের ছোঁয়ায় সেই শ্মশান একদিন সবুজ, সুধা-সঞ্চিত হয়ে উঠবে! এত অবাক আঙুর জীবনে আর কখনো হয় নি।

ঘুমন্ত বুবুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে, সে ভাবতে লাগল, কাল সকালে যদি সে পান্নাকে আর ছেলে ফিরিয়ে না দেয়, তাহ'লে কি হয়! শুধু আজকের রাত নয়, যদি বাকি জীবনটাই বুবুকে নিয়ে সে কাটিয়ে দেয়?

এক নিমেষে আঙুর স্থির করে ফেললে, বুবুকে সে আর ফেরৎ দেবে না, মানুষ করবে। কালই নতুন বাজার থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। বুবুর জামা-প্যান্ট দুধ খাবার জন্যে পদ্মকাটা কাঁসার বাটি একটা, আর একটিন বিলিতি দুধ। বড় বালিশে শুয়ে কাল হয়তো ঘাড়ে ওর ব্যথা হবে, ছোট্ট মাথার বালিশ আর ছোট্ট এক জোড়া পাশ-বালিশও কেনা দরকার।

তা ছাড়া ছেলে নিয়ে এখানে আর থাকা চলবে না। একটা ঘরও দেখতে হবে ভদ্দর পাড়ায়।

হঠাৎ কে যেন অদৃশ্য হাত দিয়ে আঙুরের চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল। এসব কি আজগুবি ভাবনা ভাবছে সে! কার ছেলে কে নেবে? ঘুবু হল ভদ্দর লোকের ছেলে, বড় ঘরের ছেলে। আর সে হল চীৎপুরের নাম-লেখানো বেশ্যা। তেলে জলে মিশ খায় কখনো।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল আঙুরের। ধড়মড় করে সে উঠে বসতেই ছোট্ট নরম হাতখানা একরত্তি পালকের মত খসে পড়ল তার বুক থেকে। ফিকে নীল আলোয় সেই ঘুমন্ত কচি মুখখানার দিকে চোখ পড়তেই আঙুরের মনে হল—না, এ-ঘরে মানায় না। আশ্চর্য, একটু আগে সে কি করে ভেবেছিল যে, সে বুবুর পাতানো মা হবে? ভূতে ধরেছিল নাকি তাকে? হয়তো তাই হবে।

নইলে একফোঁটা মদ না খেয়েও জেগে জেগে এমন আজগুবি স্বপ্ন দেখল কেন সে? চীৎপুরের এই কানাগলির আঙুরবালা হবে কিনা বুবুর মা! এর চেয়ে মজার তামাসা আর কি হতে পারে? হাসি পাবার কথা, কিন্তু আঙুরের চোখের জল শুকোয় না কেন?

ভদ্দর লোকের ছেলে এই বুবু। তার বাপ আছে, মা আছে—বুবুকে যে পেটে ধরেছে, সেই মা। কাল সকালে বুবু যখন আবার বায়না ধরবে, 'মাম যাব' তখন কি দিয়ে ভোলাবে? আর বুবুর সেই মাম?—সেও কি আজ দু-চোখের পাতা এক করতে পেরেছে, না পারবে কখনো? সেও নিশ্চয় ছেলে হারিয়ে কেঁদে কেঁদে রাত ভোর করে দিচ্ছে। আঙুরের চোখে যদি নদী, তার চোখে সাগর।

অস্থির হয়ে খাট থেকে নেমে আঙুর জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। শেষ রাতের মুখচোরা হাওয়া তার চোখে-মুখে এসে লাগল। আর সেই হাওয়াতেই সে শুনতে পেলে অনেক দূর থেকে কে

যেন কান্না-ভেজা গলায় ডাকছে বুবুকে। চমকে উঠল আঙুর। কিছু বুঝতে পারলে না, ডাকটা বাইরে থেকে আসছে, না তারই বুকের ভেতর থেকে।

আর এই কথা ভাবতে ভাবতেই আঙুরের চোখের সামনে রাতের আকাশ ফর্সা হয়ে এল। ঘাড় ফিয়িয়ে আঙুর দেখলে, বুবু তখন ঘুমে কাদা। কি যেন ভেবে 'সে এসে দাঁড়াল বেলোয়ারী আর্শির সামনে। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল ভাল করে। চুলটা .মোটামুটি আঁচড়ে নিলে, গায়ে দিলে জামা। নিকার-বোকারটা বুবুকে পরাতে গিয়েও পারলে না—যদি জেগে ওঠে।

তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকে তুলে অাঁচল চাপা দিয়ে আঙুর নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল। শহরে তখনো কাক-পক্ষী জাগে নি—শুধু ঝাড়ুদার আর রিক্সাওলা ছাড়া। পায়ে পায়ে গলিটুকু পার হতেই বড় রাস্তায় একখানা রিক্সা পাওয়া গেল। আঙুর উঠে বসে বললে, থানা।

একটা হাই তুলতে তুলতে থানার ছোটবাবু বললে, কি চাই ?

মাথার কাপড়টা একটু টেনে ভয়ে ভয়ে আঙুর বললে, ছেলেটা হারিয়ে গেছে, তাই জমা দিতে এলুম।

ছেলে হারিয়ে গেছে !—ছোটবাবুর মুখ-চোখ থেকে ঘুমের আমেজটুকু চট্ করে কেটে গেল। পুলিসী চোখ দিয়ে একবার আঙুরকে, একবার ঘুমন্ত বুবুকে দেখলেন !

হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা বলেই মনে হচ্ছে। হাতে সোনার বালা, ফর্সা, গোল-গাল, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। গলায় হার ছড়ার কথাটা খালি ডায়েরীতে লেখানো -হয় নি। কাল সন্ধ্যের মুখে

মাণিকতলা অঞ্চলে হারিয়েছিল। বড় লোকের ছেলে, খবরটা রাত দশটার মধ্যেই থানায় থানায় পৌঁছে যায়।

ছোটবাবু আর একবার আঙুরের আপাদমস্তক দেখলেন। তার-পর প্রশ্ন করলেন, কোথায় পেলে একে?

একটু থতমত খেয়ে আঙুর বললে, গঙ্গাচান করতে যাচ্ছিলুম, দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কাদের ছেলে কিছুই তো জানি নে, তাই —

হুঁ! গল্পটা সাজিয়েছো ভালো। থাকো কোথায়?

নতুন বাজারের কাছে। আঙুরের গলা শোনা যায় কি যায়'না।

অ, চাৎপুব!—ছোটবাবুর একটা চোখ ঈষৎ ছোট হয়ে এল। রাশভারি গলায় বললেন, ছেলেটাকে ওই বেঞ্চির ওপর শুইয়ে দাও।

ঘুমন্ত বুবুকে অতি সন্তর্পণে বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দিতেই ছোটবাবু আঙুরকে বললেন, তোমাকেও এখন ছাড়তে পারব না। ছেলে চুরি তোমার পুরোনো ব্যবসা মনে হচ্ছে। দরোয়াজা! লে যাও।

আঙুরের গলা থেকে বুক অবধি হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল ঠকঠক করে। খটখট শব্দে দরজায় মোতায়েন কনষ্টেবল ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারই সঙ্গে -বহুদিনের রুগীর মত এক-পা এক-পা করে আঙুর থানার লকআপে গিয়ে ঢুকল।

ঢোকবার আগে একবার ফিরে চাইল। বুবুর গলায় সোনার হারটা চিকচিক করছে। আঙুরের বুকের ভেতরটাও কখন যে অমন সোনা হয়ে গেছে, তা' কি কেউ জানে!

—

জায়গাটার আসল নাম নাই বললাম, ধরুন হলদি-ডাঙা। মাইলটাক দূরত্বের জন্যে বেঁচে গেছে। নইলে হলদিডাঙায় চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ নিশান উড়ত নিশ্চয়ই। পাকিস্তানের থাবা থেকে বেঁচে গেলেও লোকজনের বসতি খুব বেশি এখানে নেই। অথচ এককালে হলদিডাঙা বড় একটা গঞ্জ ছিল। গ্রামের পশ্চিম পাড় ঘেঁসে মরা-হাজা যে নদীটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখো চলে গেছে, সেই রূপাই নদী যখন জলে টল্‌টল্ করত, তখন একটা বন্দরও ছিল এখানে। বড় বড় মহাজনী ভড়, গহনা আর জেলে-ডিঙির গাঁদি লেগে থাকত সারা দিনরাত। মাঝি-মাল্লা, জেলে-মালো, লোক-লস্করে গম্‌গম্ করত বন্দরের জেটি।

এখন কিন্তু হলদিডাঙার সেদিন আর নেই। ছেচল্লিশ সনে মানুষ নামক জানোয়ারদের খেয়ো-খেয়ির ফলে হলদিডাঙা বিলকুল শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। বছর দু-তিন হল কিছু উদ্বাস্তু কিষাণ এসে হলদি ডাঙার শ্মশানে প্রাণের বীজ বুনছে। তবু অর্ধেকের ওপর গ্রামটা এখনও আধা-জঙ্গল হয়েই আছে। আর পশ্চিম দিকটা ন্যাড়া মাঠ।

রোদে-পোড়া এই ন্যাড়া মাঠেরই বুকে লেপটে আছে মরা-হাজা রূপাই নদী। ন্যাংটা ভৈরবের বুকে মরা সতীদেহের মত।

নদী না বলে খাল বলাই উচিত। আরও ভাল করে বোঝান যায় খাঁড়ি বললে। বছরে শুধু দুটো মাস রূপাই নদী ছল্‌ছলিয়ে ওঠে। শাওন-ভাদোতে যখন দূর-পাহাড়ের মাথায় গেরুয়া রঙের ঢল নামে।

একবার ঠিক এই সময়ের কিছু পরে, অর্থাৎ হেমন্তের গোড়ায় গিয়ে পড়েছিলাম হলদিডাঙা গাঁয়ের এই রুপাই নদীর তীরে। পাহাড়ী ঢল তখন অনেকখানি সরে গেছে। সেই বৃত্তান্তই শোনাচ্ছি। যে দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারা সবাই ফিল্ম-জগতের হোমরা-চোমরা। একমাত্র আমিই হংসমধ্যে বকো যথা। যাওয়া হয়েছিল 'নিশীথিনী' নামক একখানি ভৌতিক ছবির বহির্দৃশ্য তোলবার জন্যে। কিন্তু কে জানত যে নকল ভূতের ছবি তুলতে গিয়ে একেবারে আসল ভূতের সঙ্গে ইণ্টারভিউ হয়ে যাবে!

দৃশ্যটা হচ্ছে প্রেতিনী প্রিয়া নিশীথ রাত্রে নায়ককে ডাক দিয়েছে। সেই ডাকে নায়ক নির্জন নদীতীরে একা একা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ছায়াপ্রিয়াকে। রাতের দৃশ্য নাকি পড়ন্ত রোদে তুললেই ভাল হয়—অবশ্য বিশেষ 'ফিল্টারের' সাহায্যে। সুতরাং ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে আমরা যখন 'লোকেশানে' পৌছলাম, তখন বেলা ঢলে পড়েছে। 'লোকেশান' মানে হচ্ছে সেই ন্যাড়া মাঠের কোল ঘেঁসে রুপাই নদীরএকটা ধ্বসে যাওয়া বহু পুরনো ঘাট। ছেচল্লিশ সন্ থেকে স্থানীয় লোকেরা একে বলে 'সতী বউয়ের ঘাট'। শোনা যায়, বিগত দাঙ্গারসময় কামুক পশুদের নখদন্তের আঁচড় সারা গায়ে মেখে, কেউ কেউ বা অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে, বহু নিরুপায় গৃহস্থ বধূ রাতের আঁধারে এসে রুপাইএর জলে ডুবে মরেছে। এই রুপাই-জলে কত সতী বউয়ের সতীত্ব যে গচ্ছিত রয়েছে, কে তার হিসেব জানে!

শ' দেড়েক গজ দূরে ছোটখাট একটা টিলার ওপর দাঁড়াল ক্যামেরা। আর ক্যামেরার চারপাশে আমরা। রুপাই নদীর ভাঙা ঘাটের ওপরে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল ছবির নায়ক।

মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল ; মুখেও এলোমেলো পাতলা দাড়ি। জামা-কাপড় ছেঁড়া, ধূলায় ধূসর পা। চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি (এতই অস্বাভাবিক যে সত্যিকারের পাগলের চোখেও তেমন দৃষ্টি থাকে না।) আর মুখে মাঝে মাঝে গলা-কাঁপান ডাক, 'লতা-া-া-া…' (আওয়াজটা অবশ্য পরে রেকর্ড করে নায়কের মুখে বসান হবে)

বার দুই-তিন মহড়া দেওয়া হল। মরা নদীর ভাঙা ঘাট, পড়ন্ত বেলার লাল আলো, অপঘাতে মরে যাওয়া প্রিয়ার উদ্দেশে উদাসী নায়কের ডাক—সব মিলিয়ে মন্দ লাগছিল না। যেন থিয়েটারে 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' গোছের সিন। নায়কের ব্যাথায় মনটা ভিজে উঠেছিল। এমন সময়ে গোটা দৃশ্যটাই বেয়াড়া রকম পাল্টে গেল। ভাবের আতিশয্যে শ্রীমান নায়ক লতা লতা বলে ডাকতে ডাকতে ভাঙা ঘাটের মাথায় সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ল, ওঠবার আর নামটি নেই।

একমিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট যায়, নায়ক তবু ওঠে না। মনে হল, ভারি রিয়ালিস্টিক অভিনয় করেছে তো ছোকরা! ডিরেক্টার আর তাঁর সহকারী টিলা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ঘাটের দিকে। পিছন পিছন আমি। গিয়ে দেখি, ও হরি! এ তো রিয়ালিস্টিক অভিনয় নয়, এ যে স্রেফ দাঁতকপাটি! দাঁতি লেগে নায়ক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

ডিরেক্টার নায়কের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলেন কয়েকবার। নায়কের চোখ তবু খুলল না। বললাম, মুখে জলের ঝাপটা না দিলে জ্ঞান হবে না।

জলের সন্ধানে ডিরেক্টার এবং সহকারী ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গেলেন। কিন্তু দু-তিন ধাপ মাত্র নেমেই খাঁটি য়্যাংলো স্যাক্সন উচ্চারণে 'মাই গড়!' বলে চিৎকার করে উঠলেন

ডিরেক্টর। আর পর মুহূর্তেই খাঁটি হিন্দুর মত 'রাম রাম!' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে উঠে এসে টিলার দিক চোঁ-চাঁ ছুট! সহকারীটিও অনাথ বাছুরের মত 'আমায় ফেলে যাবেন না স্যার' বলতে বলতে প্রভুর পিছু নিল।

ব্যাপারটা কি? মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে রইলাম। আমার পায়ের কাছে হতচেতন নায়ক মৃগী রুগীর মত তখনও মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ভাঙছে। ভয় হল, মুখে-চোখে জলের ঝাপটা না দিলে নায়কের হয়ত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু ওরা দুজন জল আনতে গিয়ে কাঠবিড়ালীর মতন হঠাৎ অমন ছুটে পালাল কেন?

কারণটা জানতে অবশ্য দেরি হল না। জলের আশায় সিঁড়ির গোটা চারেক ধাপ নামতেই পা দুটো কে যেন আমার পেরেক ঠুকে পুঁতে দিল। সোজা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘাটের সব শেষের শ্যাওলা-সবুজ ধাপের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে অছে একটি নারী। নিতম্ব থেকে পা অবধি আধখানা দেহ জলে ভাসছে আর উর্ধ্বাঙ্গ রয়েছে ক্ষয়-ধরা ভাঙা ইঁটের স্তূপের ওপরে। পরনে কালো ফুলপাড় মিহিশাড়ি। হাতে-গলায়-কানে রুপোর গহনা, নাকে পাথরের নাকছাবি। বয়সে যুবতী, কোন গ্রাম্য গৃহস্থের কুলবধূ নিশ্চয়ই। কেননা মাথায় একরাশ ভ্রমর-কালো চুলের মাঝখানে চওড়া লাল সিঁদুর ডগডগ করছে।

কিন্তু কে এই কৌতুকময়ী কুলবধূ? এই অবেলায় মরা নদীর ভাঙা ঘাটে এমন করে নাইতে নেমেছে কেন? আর, ডাগর দুটো চোখ আরও ডাগর করে মেলে ভাঙা ঘাটের শেষ ধাপ থেকে ওপর পানে অমন করে তাকিয়ে আছেই বা কিসের আশায়। কি চায় ও?

হঠাৎ খেয়াল করে দেখি, কৌতুকময়ীর ডাগর দুই চোখে

পলক পড়ছে না। বহুক্ষণ থেকে। আর নীল কালি লেপা দুই ঠোঁটের ফাঁকে একসারি শাদা দাঁত কেমন একটা কঠিন ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে। এই বিকৃত মুখভঙ্গি—এরই নাম কি হাসি?

হেমন্তের বেলা তখন আরও পড়ে এসেছে। ন্যাড়া মাঠের বুকে এখানে সেখানে কুয়াশার স্তর নামতে শুরু করেছে। আরও নির্জন হয়ে এসেছে চারপাশ। হাওয়ায় কেমন একটা গা-ছম্‌ছমে ভাব। সেদিন হেমন্তের আসন্ন সন্ধ্যায় রুপাই নদীর ভাঙা ঘাটে দাঁড়িয়ে সেই ডাগব চোখ দুটোর নিষ্পলক দৃষ্টি আর নীল ঠোঁটের ফাঁকে সেই বিকৃত হাসি দেখতে দেখতে আমার জীবনে যে রোমাঞ্চকর মুহূর্তের উদয় হয়েছিল, তার সঠিক বর্ণনা আমি কোনদিনই দিতে পারব না। দেওয়াও সম্ভব নয়। একটা কথাই শুধু মনে আছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতই মনে হয়েছিল, ঘাটের শেষ ধাপ থেকে যে মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে বোবা দৃষ্টি আর নীল ঠোঁটের ফাঁকে দন্তপংক্তি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে, সে আর বেঁচে নেই।

কিন্তু মরা বলে তো মনে হয় না! মরা মানুষ কি নড়ে? মরা মানুষ কি ভাঙা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করে? ভাল করে ঠাওর করলাম। স্পষ্ট দেখলাম, রুপোর কাঁকন-পরা একখানা হাত দিয়ে ভাঙা সিঁড়ির একটা কোণ ধরে বউটি বুকে ভর দিয়ে ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর সেই চেষ্টায় তার দেহটা মাঝে মাঝে খানিকটা এগিয়ে এসেও সিঁড়ির শ্যাওলায় আবার হড়কে নেমে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে কন্‌কনে একটা অনুভূতিতে সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য, আমি পালাই নি, চিৎকার করিনি, কিছুই করিনি। হয়ত শরীরে সাড় ছিল না বলেই। তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু ভাবছিলাম, কে এই মেয়ে? হলদিডাঙার কিষাণী,

না হলদিডাঙার প্রেতিনী? একি সতী বউয়ের ঘাটে সেই সব সতীদেরই একজন, যারা বারো বছর আগে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে এসে এই রুপাই নদীর জলে তাদের সতীত্ব গচ্ছিত রেখে গেছে? হয়ত এ সেই কিষাণ-ললনা, যে ছেচল্লিশের আগষ্ট মাসে কোন এক অন্ধকার নিশীথ রাত্রে মানুষ-জানোয়ারদের হুঙ্কার শুনে আর মশালের লাল আলো দেখে সুখ শয্যায় আঁৎকে জেগে উঠেছিল। তারপর ঘরের প্রদীপ এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে খিড়কি দিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছিল এই রুপাইএর তীরে। শেষ কথাটি বলে আসা হয় নি স্বামীকে, শেষবারের মত একবার ছুঁতেও পারে নি ঘুমন্ত ছেলেটিকে! বাকি রয়ে গেল অনেক সাধ, ভরা যৌবনের অনেক স্বপ্ন। বারো বছর আগে আগষ্টের সেই ভয়ঙ্কর নিশীথে সতীত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অপূর্ণ স্বপ্ন-সাধ নদীর জলে যে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, একি হলদিডাঙার সেই মেয়ে?

হয়ত তাই হবে। হলদিডাঙার যে ঘর সে একদিন ছেড়ে এসেছিল, তার টান আজও কাটে নি! তাই বারো বছর ধরে সে লুকিয়ে আছে রুপাই নদীর ওই শ্যাওলা-সবুজ জলের তলায়। হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় চারদিক যখন ঝাপসা হয়ে আসে, আর সেই রুপাইএর বুকের ওপরে নামতে থাকে কুয়াশার স্তর, তখন বুঝি সে জলের তলা থেকে ভাঙা ঘাট বেয়ে চুপিচুপি উঠে আসে। আর, দিনের শেষ আলো যখন মুছে যায়, তখন এই দিগন্তজোড়া ন্যাড়া মাঠের নির্জন শ্মশানভূমিতে কেঁদে কেঁদে তার সেই ফেলে-আসা ঘর খুঁজে বেড়ায়। কতকাল স্বামীকে সে ভাত দেয় নি, দুধ দেয় নি কাঁদুনে ছেলেটাকে, কতকাল অগোছালো হয়ে আছে নিজের হাতে গড়া এক-টুকরো সংসার।

আঁধার রাতে তার এই অতৃপ্ত তৃষ্ণা হয়ত আলেয়া হয়ে ন্যাড়া মাঠে ছুটোছুটি করে। আর থেকে থেকে হু-হু হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়ায় প্রেতিনী বউয়ের বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না!

আজও নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না, কেমন করে সেদিন সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে রুপাই-এর ভাঙা ঘাটে একা দাঁড়িয়ে এত কথা ভেবেছিলাম।

*   *   *   *   *

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন স্যার ?

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি মেকআপ-ম্যান বঙ্কু এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে। বাতাসে একটা পরিচিত গন্ধ পেয়ে বুঝলাম বঙ্কু সুধাপান করেছে। ভাত সে রোজ খায় কিনা জানি না, কিন্তু সুধাপানে তার একদিনও কামাই হয় না।

বঙ্কু বললে, খাসা জায়গাটি। একদিন বাগান-পার্টি করলে হয় এখানে।

সেই অদ্ভুত আবহাওয়ার মধ্যেও বঙ্কুর কথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। বঙ্কু আবার বললে, অত তন্ময় হয়ে কি দেখছেন স্যার ? মরা মেয়েছেলে দেখে আর লাভ কি ?

বললাম, মরা মানুষ কি নড়ে বঙ্কু ? মরা মানুষ কি ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে ? ওই দেখ—

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে আমাদের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে প্রেতিনী বৌ তখনও বুকে ভর দিয়ে ওঠবাব চেষ্টা কবছে !

ভেবেছিলাম এবারে বঙ্কুর সুধাব নেশা কেটে যাবে এবং 'রামনাম' স্মরণ করে সোজা চম্পট দেবে। কিন্তু না, তার বদলে মাতাল বঙ্কু একটা বিচিত্র কাণ্ড কবে বসল। মিনিটখানেক জলে ভাসা লাশটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ একখানা আধলা ইট কুড়িয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলে সামনে দিকে। ইটখানা গিয়ে লাগল মৃতদেহের পেটের কাছটায়। আর সঙ্গে সঙ্গে 'কেঁউ-কেঁউ' রবে সকরুণ আর্তনাদ তুলে মৃতদেহের পেটের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটি দেশী নেড়ি কুকুর। তারপর ল্যাজ গুটিয়ে সভয়ে প্রস্থান।

অট্টহাস্যে বঙ্কু তখন ন্যাড়া মাঠ কাঁপিয়ে তুলেছে।

এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম মৃতদেহের পেটের কাছে একটা বিরাট গহ্বর। খিদের জ্বালায় নেড়ি কুকুরটি তারই মধ্যে ঢুকেছিল ! আসলে নড়ছিল কুকুরটাই, মরা চাষী-বউ নয়।

ঘাটের ওপরে একটা অস্ফুট শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি নায়কের জ্ঞান ফিরেছে।